BanglaBook.org

মার্ডার ডট কম

অনীশ দেব

...হঠাৎই ফোন বাজতে শুরু করল। ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি। তারপরই বুঝলাম, পকেটে আমার সেল-ফোন বাজছে।

ফোনটা পকেট থেকে বের করে অফ করে দিলাম। সুরেলা বাজনা থেমে যেতেই ফ্ল্যাটটা আগের চেয়ে দ্বিগুণ নিস্তব্ধ মনে হল।

যে-ঘরটায় আলো জ্বলছিল, পা টিপে-টিপে সেই ঘরটার দিকে এগোলাম। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। এবং রাজধানী এক্সপ্রেস যেন দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে আমার হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মারল। বুকের ভেতরে ধুকপুকুনি থমকে গেল কয়েক লহমার জন্যে। তারপরই তাড়া খাওয়া কাঠবেড়ালীর মতো ছুটতে শুরু করল ঃ ধকধক...ধকধক...।

ঘরের ধবধবে বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে প্যান্ট-শার্ট পরা একজন মানুষ। তার হাত-পা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, মুখের ওপরে একটা বালিশ চাপা দেওয়া রয়েছে।...

তারপর...

অনীশ দেব ঃ জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা ঃ হিন্দু স্কুল। সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম. টেক. ও পি এইচ. ডি.। পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক।

কর্মজীবনে ১৯৮৩ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৬ থেকে প্রফেসার।

লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'য়। প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস/গল্পগ্রন্থ ঃ ঘাসের শিষ নেই, সাপের চোখ, তীরবিদ্ধ, জীবন যখন ফুরিয়ে যায়, ছায়ার মতো মানুষ ইত্যাদি।

জনপ্রিয়-বিজ্ঞান গ্রন্থ ঃ বিজ্ঞানের হরেকরকম, হাতে-কলমে কম্পিউটার ও বেসিক প্রোগামিং, বিজ্ঞানের দশদিগন্ত ইত্যাদি।

প্রধান নেশা ঃ রহস্য-গোয়েন্দা, অলৌকিক ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখালেখি, জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং কম্পিউটার।

পুরস্কার ঃ প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮) ও ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯)।

সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের 'গল্পপত্র' পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।

মার্ডার ডট কম

অনীশ দেব

মার্ডার ডট কম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল ঃ patrabha@vsnl.net

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০২

MURDER DOT COM
by
Anish Deb

ISBN No. 81-86986-73-1

প্রচ্ছদ
বরুণ রায়

অলংকরণ
অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য
৪৫.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phone 241 1175 Fax 354 0462
e-mail : patrabha@vsnl.net
Price Rs. 45.00

পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

গীতা শ্রীমানী

সমীরবরণ শ্রীমানী

প্রীতিভাজনেষু

মার্ডার ডট কম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

॥ এক ॥

মাউসে ডাব্‌ল ক্লিক করতেই মনিটরে রঙিন ছবিটা পালটে গেল। আর ঠিক তখনই পারফিউমের গন্ধ নাকে এল আমার। সুতরাং কিবোর্ডে আঙুল চালানো থামিয়ে মনিটরের দিক থেকে চোখ সরালাম।

বর্ষা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী দারুণ দেখাচ্ছে ওকে! গাঢ় নীলের ওপরে সাদা-ফুল চুড়িদার। গলায় সাদা ওড়না। কপালে টিপ, চোখে কাজল। নাকে সরষের দানার মতো নাকছাবি।

অফিসের কাজ ছাড়া আমার কাছে ও খুব একটা আসে না। আর যদিও বা হঠাৎ করে আসে, তো দু-পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না। আমিই বরং 'এই প্রোগ্রামটা কেমন যেন ট্রাবল দিচ্ছে,' 'অমুক ফ্লপিটা কি তোমার কাছে আছে?', 'ম্যানেজারসাহেব ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে কোথায় গেলেন বলো তো!' —এই সব ছলছুতোয় ওর সিটের কাছে যাই। সেখানে আশাবাদী দু-চারজন পুরুষের ভিড় সবসময়েই লেগে আছে। তাই আমার কেমন যেন লজ্জা করে। অথচ ওর কাছে না গিয়েও পারি না। ভেতর থেকে কে যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

বর্ষার টেবিলের কাছে গেলেই আমার অস্কার পুরস্কারের কথা মনে পড়ে। 'দ্য নমিনিজ আর...' বলেই চার-পাঁচটি নাম। আর তারপরই '...অ্যান্ড দ্য অ্যাওয়ার্ড গোজ টু...'। এই অফিসের চার-পাঁচজন সেই অস্কার নমিনির মতোই ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে—তার মধ্যে আমিও আছি। অ্যাওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত কে পাবে জানি না।

'রীতেনদা, একটা হেল্প করবেন?'

এরকম মিষ্টি অনুরোধে সমরখন্দ-বোখারাও দিয়ে দেওয়া যায়। তাই বললাম, 'তোমাকে হেল্প করার জন্যে আমি আপাদমস্তক তৈরি। বলো, কী করতে পারি। ইট উইল বি মাই প্লেশার।'

বর্ষা আমার পাশের একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর মুখে একটা ছেলেমানুষী কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে আবদারের গলায় বলল, 'আপনার মোবাইল ফোনটা একটু ইউজ করতে দেবেন?'

আমি বুক পকেট থেকে নোকিয়া সিক্স-ওয়ান-ওয়ান-জিরোটা বের করে ওর হাতে দিলাম। বললাম, 'ইচ্ছে হলে সারাদিন রাখতেও পারো।'

'না, না—জাস্ট একটা ফোন করব।' হাসল ও ঃ 'অফিসের ফোন থেকে কিছুতেই লাইন পাচ্ছি না।'

বর্ষা আমার সামনে বসেই বোতাম টিপতে শুরু করল।

'আমি কি সিট ছেড়ে উঠে যাব?'

BanglaBook.org

'না, না, আপনি থাকতে পারেন। প্রাইভেট কিছু নয়...দিদির সঙ্গে একটু কথা বলব।'

আমি কম্পিউটারে কাজ বন্ধ রেখে বর্ষাকে অনুভব করতে লাগলাম।

আমাদের অফিসটা এয়ার কন্ডিশন্ড, কিন্তু কাচের জানলা দিয়ে বাইরের গনগনে রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে শীত-গ্রীষ্ম এবং বর্ষা...দারুণ!

ফোন শেষ করে হ্যান্ডসেটটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে-দিতে বর্ষা বলল, 'অনেক চার্জ উঠল, না?'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, সাংঘাতিক। কাল থেকে আমাকে টোল-পড়া অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে নীচে গণেশ অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে ঘুরতে হবে।'

বর্ষা হাসল। ওর গালে টোল পড়ল।

'তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে! আজকের দিনটা সাবধানে থেকো।'

'কেন!'

'আমাদের অফিসে নেকড়ে আর হায়েনা তো কিছু কম নেই!'

বর্ষা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে, মনে হল আমাকে ও তার মধ্যে ধরবে কি ধরবে না ভাবছে।

এমন সময় প্রকাশ রায়চৌধুরী এগিয়ে এল আমাদের কাছে।

ফরসা, লম্বা-চওড়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গলায় সোনার চেন, একটু ওভারস্মার্ট। ও একজন অস্কার নমিনি। তাই বর্ষাকে আমার কাছে পাঁচমিনিটের বেশি বসতে দেখে সাঙ্ঘাতিকরকম উতলা হয়ে পড়েছে।

আমার দিকে আড়চোখে একপলক দেখে বর্ষার দিকে মনোযোগ দিল প্রকাশ ঃ 'হাই রেইন, আমার কম্পিতে কিছু ডেটা ঢোকানোর ব্যবস্থা করো। মাই মেশিন ইজ স্টার্ভিং।'

বর্ষাকে প্রকাশ রেইন বলে। তাই আমি ওকে মনে-মনে বলি 'রেইনম্যান'।

আমার হাতের মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল প্রকাশ ঃ 'মোবাইল ফোনটা নেওয়ার পর রীতেনদার স্ট্যাটাস কিন্তু হেভি বেড়ে গেছে। আগে রীতেনদাকে কেউ পাত্তা দিত না—এখন থোড়া-থোড়া দিচ্ছে।'

প্রকাশ বর্ষাকে আর-একবার ডেটার তাগাদা দিয়ে চলে গেল।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার মুখ আর কান বেশ লাল হয়েছে।

বর্ষা নরম গলায় বলল, 'প্রকাশদার কথায় কিছু মাইন্ড করবেন না।'

'না, মাইন্ড করিনি। ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট ঃ নেকড়ে হায়েনাকে কামড় বসিয়ে গেল।'

BanglaBook.org

খিলখিল করে হেসে উঠল বর্ষা। আমার বুকের ভেতরে পাগলা হাওয়া নেচে উঠল।

হঠাৎ দেখি আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজার মঙ্গল পুরকায়স্থ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আড়ালে ওঁকে আমরা 'মংপু' বলে ডাকি।

মংপুও একজন অস্কার নমিনি। যদিও ওঁর বয়েস পঞ্চান্ন—একটি ছেলে, একটি মেয়ে, এবং একটি হস্তিনী স্ত্রী আছে।

আমি চাপা গলায় বর্ষাকে বললাম, 'আর-একটা গোদা নেকড়ে আসছে। তুমি সিটে ফিরে যাও। আমি আর কামড় খেতে চাই না। বরং বিকেলের দিকে দশমিনিট গল্প করতে যাব।'

বর্ষা 'ও. কে.' বলে চটপটে পায়ে নিজের সিটের দিকে রওনা দিল।

আর কী আশ্চর্য! মংপুও কম্পাসের অনুগত কাঁটার মতো গতিপথ পালটে বর্ষার পিছু-পিছু হাঁটতে শুরু করল।

গত চার-পাঁচ বছরে যে-ক'টা সফ্‌টওয়্যার কোম্পানি নাম করেছে তার মধ্যে আমাদের কোম্পানি 'সফ্‌ট কর্পোরেশন' বেশ এগিয়ে রয়েছে। এখানে প্রোগ্রামার হিসেবে মাইনে আমি খারাপ পাই না। কিন্তু ফ্যামিলি বার্ডেন থাকায় অর্ডার সাপ্লাইয়ের ছোটখাটো একটা ব্যবসাও চালাই। ব্যবসার খাতিরেই মাসদুয়েক হল মোবাইল ফোনটা নিয়েছি। আমার ছোটভাই ব্রতীন বি.এস-সি. পাশ করেছে গত বছর। তারপর ব্যবসায় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে বেশ খানিকটা হাঁফ ছাড়তে পারছি।

হঠাৎই 'বিপ-বিপ' করে দুবার শব্দ হল।

চমকে উঠলাম। প্রথমে মনে হল আমার ফোনের ব্যাটারি হয়তো কাবু হয়ে পড়েছে। কারণ, ব্যাটারি লো হলেই 'বিপ' শব্দ হয়। কিন্তু সে তো একটা শব্দ—দুবার তো নয়! তখনই খেয়াল হল, সেল-ফোনে কেউ কোনও মেসেজ পাঠালে দুবার 'বিপ-বিপ' শব্দ হয়। দিনসাতেক আগে হ্যান্ডসেট রিপেয়ার করার একজন টেকনিশিয়ানের মেসেজ পেয়েছিলাম—সঙ্গে তার মোবাইল নাম্বার।

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে দেখি তার এল সি ডি প্যানেলে একটা মেসেজ ফুটে উঠেছে। মেসেজটা ভারি অদ্ভুত ঃ

'সেক্সি ফ্রেন্ডশিপ উইথ সুইট লেডিজ। সিক্রেসি গ্যারান্টিড।
কল ৯৮৩০০ ০১২৩৪।'

তার মানে! মিষ্টি মেয়েদের সঙ্গে অন্যায় বন্ধুত্ব! কেউ জানতে পারবে না!

BanglaBook.org

মিনিটখানেকের জন্যে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার কখনও সেরকম ঘনিষ্ঠতা হয়নি। সেরকম কোনও সুযোগও আসেনি।

আমার পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই বাপি চলে গেছেন। একমাত্র বোন মিলি আর ওর পরের ভাই ব্রতীন তখন বেশ ছোট। মা ক্রনিক আলসারের রুগি। কী করে যে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়েছি সে আমিই জানি! আজ মায়ের বয়েস আরও বেড়েছে, আরও অসুস্থ হয়েছে। মিলির এখনও বিয়ে দেওয়া হয়নি। মা সবসময় সেই চিন্তা করে। আমি মায়ের কাছে আরও দুটো বছর সময় চেয়েছি। বলেছি, আমি আর ব্রতীন মিলে ব্যবসা দাঁড় করিয়ে মিলিকে ভালোভাবে পাত্রস্থ করব। কিন্তু মাঝে-মাঝে নিজেরই মনে হয়, শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারব তো! বাপি চলে গিয়ে আমাকে বড় অসহায় করে গেছেন।

নিজেকে নিয়ে আমি বেশ ভাবি। বয়েস তিরিশ পেরিয়ে গেল। একজন সুপুরুষ যুবকের জীবনে যেসব সুন্দর-সুন্দর ঘটনা ঘটে তার কিছুই আমার কপালে জুটল না। বন্ধুবান্ধবের মুখে কত রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনি। শুনে রাতে কত উলটোপালটা কল্পনা করি। বর্ষাকে কত আদর করি। মাধুরী দীক্ষিত কিংবা জুলিয়া রবার্ট্‌সও আমার ভালোবাসাবাসির ছায়া-যুদ্ধ থেকে বাদ যায় না। আমার মধ্যে যে একটা প্রেমিক মন আছে সেটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি না।

হয়তো সেইজন্যেই মোবাইল ফোনের মেসেজটা আমার মনে দাগ কাটল। ফোন-নাম্বারটা মুখস্থ হয়ে গেল সহজেই। তারপর ভাবলাম, এ আবার সেই 'পার্টি লাইন' বা 'টেলি-ফ্রেন্ড'-এর মতো নয়তো! যতো ভালোবাসা শুধু টেলিফোনে! সেও তো আর-একরকম ছায়া-যুদ্ধ!

না, ওসব টেলিফোন-ঠেলিফোন নয়। আসল ব্যাপারটা আমার একবার চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে।

তা হলে ওই নম্বরে পরে একটা ফোন করে দেখলে কেমন হয়!

আমার সফ্‌টওয়্যার ডেভেলাপমেন্টের কাজে বারবার ভুল হয়ে যেতে লাগল। যতই ছুটির সময় কাছে এগিয়ে আসতে লাগল ততই ভেতরে-ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ টেবিল ছেড়ে বর্ষার কাছে গেলাম।

ও একমনে কম্পিউটারে কাজ করছিল। অস্কার-নমিনিরা কেউ ধারে-কাছে নেই—শুধু আমি ছাড়া।

BanglaBook.org

ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল ও। ডান হাতের সুন্দর আঙুলগুলো মাউস আঁকড়ে রয়েছে। মাউসটা আমার হাত হতে পারত।

'বলুন, রীতেনদা—।'

আমি চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। প্লাস্টিক আর কাচের পার্টিশন দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট কিউবিক্‌ল। যে-যার সিটে বসে কাজ করছে। শুধু এয়ারকুলারের ভোমরার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

'কখন বেরোবে অফিস থেকে?' আমি আলতো করে জিগ্যেস করলাম।

'হাতের কাজটা কমপ্লিট হলেই বেরোব। একটু দিদির বাড়ি যেতে হবে।'

বর্ষার বাড়ি শুনেছি এন্টালির দিকে। আর আমার সূর্য সেন স্ট্রিটে। তবুও অনেক সময় ওর সঙ্গে বাস স্টপ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়। তবে একা নয়—আরও দু-একজন নমিনি সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে। কোনও-কোনও দিন মঙ্গল পুরকায়স্থ বর্ষাকে লিফ্‌ট দেন। বর্ষার কাছেই শুনেছি, মাঝে-মাঝেই নাকি উনি বর্ষাকে লাঞ্চ কিংবা ডিনারের প্রস্তাব দিতে ছাড়েন না।

সাহস করে বলতে পারলাম না, ঠিক আছে, দুজনে একসঙ্গে বেরোব। তার বদলে মুখ ফসকে অস্কার পুরস্কারের ব্যাপারটা ওকে বলে ফেললাম। শুনে ও তো হেসেই অস্থির।

আমি ওর হাসি দেখছিলাম। আর এদিক-ওদিক থেকে চার-পাঁচ জোড়া চোখ আমাদের দেখছিল।

ওর হাসির ঝিলিক কমলে পর বললাম, 'দ্যাখো, স্পষ্ট কথা বলাই ভালো। আমি কিন্তু সাধুপুরুষ নই—আমিও একজন অস্কার নমিনি।'

আবার খিলখিল হাসি। তারপর ঃ 'আপনি দারুণ জোক করতে পারেন। অস্কার অ্যাওয়ার্ড...অস্কার নমিনি...মাই গুডনেস!' হাসির চোটে ওর চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল। আঙুল বুলিয়ে সেই জল মুছে নিল বর্ষা।

বর্ষার কাছে এলে আমার কী যে হয়! মনের সব কথা উজাড় করে বলতে ইচ্ছে করে। মোবাইল ফোনে আসা মেসেজটাও ওকে বলতে ইচ্ছে করল। তাই ভয় পেয়ে নিজের সিটে ফিরে এলাম।

আসার পথে লক্ষ করলাম, প্রকাশ রায়চৌধুরী দূর থেকে আমাকে দেখছে।

সেদিন রাতে, আটটা নাগাদ, মেসেজটা আর-একবার এল।

আমি পাড়ার চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা সামনে নিয়ে বর্ষার কথা ভাবছিলাম। মন-টন ভীষণ খারাপ। তখনই 'বিপ-বিপ' শব্দটা হল।

BanglaBook.org

হঠাৎই মাথার মধ্যে কী যে হল, উচ্ছৃঙ্খল হতে খুব সাধ জাগল। বর্ষার ওপর অনেকটা অভিমান নিয়েই চায়ের কাপ ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। কাছাকাছি একটা ফোন বুথে ঢুকে পড়ে বোতাম টিপলাম ঃ ৯৮৩০০ ০১২৩৪।

একটু পরেই ও-প্রান্তে একজন মহিলার মিষ্টি গলা পেলাম।

'হ্যালো—।'

'আপনারা আমার মোবাইল ফোনে একটু আগে একটা...একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। সকালেও মেসেজটা একবার পেয়েছিলাম।'

'আপনার মোবাইল নাম্বারটা কাইন্ডলি বলবেন?'

নাম্বার বললাম।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি মিস্টার রীতেন মিত্র?'

'হ্যাঁ—।' আমার গলাটা হঠাৎই কেমন শুকিয়ে গেল। ওরা আমার নাম জানল কেমন করে! তা হলে কি সবার মোবাইল নাম্বার আর নামের লিস্ট তৈরি করে তারপরই ওরা মেসেজ পাঠাতে শুরু করেছে!

'আপনারা...মানে আমার নাম...ইয়ে...।'

'রিল্যাক্স, মিস্টার মিত্র। আপনি ফর নাথিং নার্ভাস হচ্ছেন। আমাদের বিজনেসের ক্যাপিটালই হল সিক্রেসি আর প্রাইভেসি।' মহিলা আমাকে আশ্বাস দিলেন ঃ 'আপনি কাল সন্ধে সাতটায় আমাদের অফিসে চলে আসুন। আমাদের এনরোলমেন্ট ফি দুশো টাকা। আর তারপর সার্ভিস অনুযায়ী চার্জ। ঠিক সাতটায় আসবেন কিন্তু!'

এরপর তিনি পার্কসার্কাস অঞ্চলের একটি ঠিকানা বললেন। কীভাবে সেখানে পৌঁছতে হবে সেটা পাখি-পড়া করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। এখানে এলে আপনার ভালো লাগবে। তবে মনে রাখবেন, তিনতলার ফ্ল্যাট —ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটে লেখা আছে "মিস্টার পি. দত্তগুপ্ত, ক্লিয়ারিং এজেন্ট"। ওখানে লোক থাকবে। তাকে দুশো টাকা দিয়ে দেবেন—ক্যাশ। তারপর আমরা আপনাকে খুশি করার জন্যে যা-যা করা দরকার করব। গুডনাইট।'

কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলাম আমি। মনে-মনে বেশ কৌতূহল হচ্ছিল। দুশো টাকা খুব একটা বেশি নয়? তারপর কত—তিনশো, পাঁচশো, হাজার? একবার, মাত্র একটিবার, ব্যাপারটা চেখে দেখতে ক্ষতি কী! মা, মিলি, ব্রতীন, বর্ষা—কেউ কিছু টেরই পাবে না।

সুতরাং পরদিন কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধে সাতটায় দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম।

BanglaBook.org

॥ দুই ॥

পালিশ করা বিশাল কাঠের দরজা। তাতে 'ম্যাজিক আই' লাগানো। দরজার ডানদিকের ফ্রেমে কলিংবেলের বোতাম।

নেমপ্লেটের লেখাটা আর-একবার পড়ে নিয়ে কলিংবেলের বোতাম টিপলাম।

দত্তগুপ্তদের ফ্ল্যাটবাড়িটা বেশ পুরনো ধাঁচের। এক-একটা তলার হাইট প্রায় পনেরো-ষোলো ফুট হবে। বাড়ির বাইরের চেহারাটা জব চার্নক হলেও ভেতরটা ঋত্বিক রোশন। অভিজাত পয়সাওয়ালা মানুষজনই এইসব ফ্ল্যাটে থাকে।

বাড়িতে ঢুকেই প্রথম যে-ব্যাপারটা আমার নজর কেড়েছে সেটা নির্জনতা। সিঁড়ি আর অলিন্দ দেখে মনে হয় না কেউ এখানে থাকে।

শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলতেই পারফিউমের উগ্র গন্ধ আমাকে স্বাগত জানাল।

দারুণ সাজগোজ করা একজন মহিলা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে। ফরসা, গোলগাল চেহারা, কোঁকড়ানো চুল। বয়েসটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে, মেকাপের কথা আর শুনছে না।

মহিলা বড়-বড় শ্বাস ফেলছিলেন। ওঁর ভারি বুক ওঠা-নামা করছিল।

আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছিল অকারণেই। বেশ টের পাচ্ছিলাম, কপালের পাশ দিয়ে ঘামের রেখা গড়িয়ে নামছে।

রুমাল বের করে ঘাম মুছে নিয়ে আমি বললাম, 'আমার...আমার নাম রীতেন মিত্র। সাতটায় আমার আসার কথা ছিল।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর মুখটা মিষ্টি হয়ে গেল।

'আসুন, ভেতরে আসুন।' ওঁর গলাও দারুণ মিষ্টি।

আমি ভেতরে ঢুকতেই মহিলা দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

সামনের ঘরটা রিসেপশান কিউবিক্‌লের ঢঙে সাজানো। বাঁদিকে ঝকঝকে কাউন্টার—তার ওপরে টেলিফোন আর কম্পিউটার। পাশেই রাখা নোটপ্যাড আর পেন।

ডান দিকের কোণে একটা সুদৃশ্য টুলে রাখা আছে একটা চিনেমাটির ফুলদানি—তাতে রংবেরঙের ফুলের তোড়া বসানো। তার পাশ ঘেঁষে লম্বা একটা সোফা। সোফার ঠিক ওপরে দেওয়ালে টাঙানো একটা রঙিন ছবি। ছবিতে কয়েকটি মেয়ে লোভনীয় ঢঙে দাঁড়িয়ে। ওদের শরীরের ওপরে লেবেল সাঁটার

BanglaBook.org

মতো করে একটা ইংরেজি ক্যাপশান লেখা ঃ সে হ্যালো টু এভরিবডি। তার পাশেই একটা ক্যালেন্ডার আর একটা ফুটফুটে বাচ্চার ছবি ঝুলছে। অন্যায় খেলার ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও।

ফ্ল্যাটটা কেমন নিঝুম আর ফাঁকা-ফাঁকা। তাতে আমার একটু অবাক লাগছিল। কিন্তু ওরাই তো ফোনে বলেছে, সিক্রেসি আর প্রাইভেসি ওদের ক্যাপিটাল! তাই হয়তো এ-সময়টায় আর-কাউকে আসতে বলেনি।

ভদ্রমহিলা কেমন যেন এলোমেলো ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন। নার্ভাসভাবে বারবার শাড়ি ঠিক করছিলেন। আমাকে সোফায় বসতে বলে কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে এদিক-ওদিক হাঁটকাতে লাগলেন।

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে ঢোঁক গিলে বললাম, 'আমার... দুশো টাকা দেওয়ার কথা ছিল।' টাকাটা পকেট থেকে বের করে ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

কাঁপা হাতে টাকাটা নিয়ে রিসেপশান কাউন্টারের একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমি মিস্টার দত্তগুপ্তকে খবর দিচ্ছি।'

একটা কাঠের দরজা ঠেলে মহিলা ফ্ল্যাটের ভেতরের দিকে চলে গেলেন। আমি দুরুদুরু বুকে অন্যায় অভিযানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিটখানেক পরেই ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন। ছোট্ট করে হেসে বললেন, 'আপনি বসুন, উনি এখুনি আসছেন। আমি আপনার জন্যে কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসছি—।'

কথাটা বলেই মহিলা ফ্ল্যাটের সদর দরজা খুলে ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। আমি অপেক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়ে টেনশান কাটাতে একটা সিগারেট ধরালাম।

প্রায় মিনিট পনেরো কেটে যাওয়ার পর আমার ধৈর্যে টান পড়ল। দত্তগুপ্তের হল কী! সিগারেট কখন শেষ হয়ে গেছে! ঘড়ির কাঁটা সোড়ে সাতটার ঘরে পৌঁছে গেছে। নাঃ, এবার একটু খোঁজ করা দরকার।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে তারপর ফ্ল্যাটের ভেতরে যাওয়ার দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কান পেতে কথাবার্তার শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। না, কোনও শব্দ নেই। এই ফ্ল্যাটটা বোধহয় শুধুই যোগাযোগের অফিস। সুইট লেডিজরা থাকে অন্য কোথাও— হয়তো নিজের-নিজের আস্তানায়।

দরজায় চাপ দিতেই পাল্লা খুলে গেল।

BanglaBook.org

সামনেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পুরনো আমলে বারান্দা ছিল, এখন ডাইনিং স্পেস। আলো নেভানো থাকায় আবছা আঁধার ছড়িয়ে রয়েছে। তার ডানদিকে দুটো ঘর। দুটো ঘরের দরজাই হাট করে খোলা। একটা অন্ধকার, অন্যটায় আলো জ্বলছে।

চুরুটের হালকা গন্ধ নাকে আসছিল। মিস্টার দত্তগুপ্ত কি চুরুট খাচ্ছেন?

হঠাৎই ফোন বাজতে শুরু করল।

ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি। তারপরই বুঝলাম, পকেটে আমার সেল-ফোন বাজছে।

ফোনটা পকেট থেকে বের করে অফ করে দিলাম। সুরেলা বাজনা থেমে যেতেই ফ্ল্যাটটা আগের চেয়ে দ্বিগুণ নিস্তব্ধ মনে হল।

যে-ঘরটায় আলো জ্বলছিল, পা টিপে-টিপে সেই ঘরটার দিকে এগোলাম।

ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। এবং রাজধানী এক্সপ্রেস যেন দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে আমার হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মারল। বুকের ভেতরে ধুকপুকুনি থমকে গেল কয়েক লহমার জন্যে। তারপরই তাড়া খাওয়া কাঠবেড়ালীর মতো ছুটতে শুরু করল ঃ ধকধক...ধকধক...।

ঘরের ধবধবে বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে প্যান্ট-শার্ট পরা একজন মানুষ। তার হাত-পা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না—কারণ, মুখের ওপরে একটা বালিশ চাপা দেওয়া রয়েছে।

ইনিই কি মিস্টার পি. দত্তগুপ্ত? কে জানে!

কৌতূহল আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরের সর্বত্র বিলাসিতার সিলমোহর। আসবাবপত্র, বিছানা, লাইট, ফ্যান সবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। তবে ঘরে পাগলের মতো অনুসন্ধান চালিয়ে কেউ সাজানো-গোছানো ঘরটাকে ছন্নছাড়া করে তুলেছে। বেশ কয়েকটা ড্রয়ার খোলা। আলমারির পাল্লা খোলা। জামাকাপড়, কাগজপত্র সব মেঝেতে ছড়ানো।

ঘরের এক কোণে বিদেশি রঙিন টিভিতে বিবিসি-র খবর চলছে। কিন্তু ভলিয়ুম কমানো থাকায় কোনও শব্দ হচ্ছে না। আর হলেও বিছানায় বিচিত্র ঢঙে শুয়ে থাকা ভদ্রলোকের কানে সে-আওয়াজ নিশ্চয়ই ঢুকত না।

বিছানার খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই বালিশের গায়ে পোড়া গর্তটা আমার নজরে পড়ল। বালিশটা একটানে সরাতেই দত্তগুপ্তকে—কিংবা বলা ভালো, দত্তগুপ্তের পাস্ট টেন্সকে—দেখা গেল। ওঁর ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুখটা আসলে কেমন ছিল সেটা বুঝতে হলে প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রয়োজন। ওঁর মাথার

BanglaBook.org

নীচের বালিশটা লাল। কখনও যে ওটা সাদা ছিল সেটা বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়।

হাতুড়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি দত্তগুপ্তের পাল্‌স দেখার চেষ্টা করলাম। অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। তবে ওঁর শরীরটা এখনও গরম আছে। মানে, যে-ই ওঁকে খুন করে থাকুক—ব্যাপারটা খুব বেশি আগে হয়নি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রিভলভারটা চোখে পড়ল না।

কে খুন করল দত্তগুপ্তকে? ওই মহিলা নয় তো! ওঁর আচরণ কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু মেয়েরা কি এরকম নৃশংসভাবে রিভলভার ব্যবহার করে?

আমি যখন এই ফ্ল্যাটে আসি তখন দত্তগুপ্ত নিশ্চয়ই ওপারে চলে গেছেন। কারণ, যতই মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আওয়াজ বন্ধ করার চেষ্টা হোক না কেন একটা ভোঁতা শব্দ নিশ্চয়ই আমার কানে আসত। এমনও তো হতে পারে, দত্তগুপ্তকে খুন-টুন করে ভদ্রমহিলা যখন ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাওয়ার মতলব আঁটছিলেন ঠিক তখনই আমি এসে হাজির হয়েছি।

হতে পারে অনেক কিছুই। এখন ওই ভদ্রমহিলার খোঁজ করা দরকার। উনি যদি খুনি নাও হন, উনি নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানবেন। কোল্ড ড্রিঙ্কস আনার নাম করে উনি গেলেন কোথায়! চম্পট দেননি তো!

এই প্রথম কৌতূহলকে ছাপিয়ে ভয় আমার মনে জায়গা করে নিল। ঠাণ্ডা ঘাম তৈরি হল বুকে-পিঠে। তারপর ধীরে-ধীরে গড়িয়ে-গড়িয়ে নামতে লাগল।

একটা নির্জন ফ্ল্যাটে আমি আর একটা ডেডবডি! এখন যদি কেউ আসে তা হলে কী ভাববে? যদি পুলিশ আসে!

প্রায় দৌড়ে রিসেপশানে চলে এলাম। আমাকে চমকে দিয়ে রিসেপশানের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

নিস্তব্ধ ফ্ল্যাটে টেলিফোনের আওয়াজ আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছিল। তাই রিসিভারটা তুলে কাউন্টারের ওপরে নামিয়ে রাখলাম। ফোনে একটা পুরুষকণ্ঠ 'হ্যালো—হ্যালো—' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল।

হঠাৎই আমার মনে হল, আমার নাম, মোবাইল নাম্বার সবই দত্তগুপ্তদের কাছে রয়েছে। এই খুনের তদন্ত করতে এসে পুলিশ যদি সেসব খুঁজে পায় তা হলে আমাকেই হয়তো মার্ডারার বলে সন্দেহ করবে। তা ছাড়া বাড়িতে অফিসে সবাই জেনে যাবে আমি এই ফ্ল্যাটে কেন এসেছিলাম। আমার মনের

BanglaBook.org

অবস্থাটা কেউ বুঝতে চাইবে না। শুধু অভিযোগের আঙুল তুলেই চেনা-জানা মানুষজন তাদের দায়িত্ব শেষ করবে।

চটপট চলে গেলাম রিসেপশান কাউন্টারের ওপারে। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে আমার নাম আর মোবাইল নাম্বার থাকাটা অসম্ভব নয়। মেশিনটা অন করাই ছিল। অভ্যস্ত হাতে হার্ড ডিস্কের সব ফাইল মুছে ফেলার নির্দেশ দিলাম। কম্পিউটার জানতে চাইল আমি সত্যিই সব ফাইল মুছে ফেলতে চাইছি কি না। উত্তরে আমি ওয়াই টিপে এন্টার বোতামটা টিপে দিলাম।

এইভাবে পাগলের মতো একের পর এক ডিরেক্টরি মুছে ফেলতে লাগলাম।

কম্পিউটার যখন মুছে ফেলার কাজ করছিল সেই সময়ে আমি সবক'টা ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র হাঁটকাতে লাগলাম।

খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎই একটা ডায়েরিগোছের খাতা পেয়ে গেলাম। তাতে অনেক মেয়ের নাম লেখা—নামের পাশেই লেখা রয়েছে টেলিফোন নাম্বার। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল। প্রতিটি মেয়ের নামের পাশে ব্র্যাকেটে একটি করে নাম লেখা রয়েছে। যেমন, শ্রীজাতা সরকার (সিমি) ঃ ২৪৩ ৭১১২।

লিস্টটায় দ্রুত নজর বোলাতে গিয়ে মারাত্মক একটা ধাক্কা খেলাম।

বর্ষা দাশগুপ্ত (কঙ্কণা) ঃ ২৪৫ ০৮৬৩।

বর্ষার নাম এখানে কেন! ওর ফোন নাম্বার জানি না, তবে নাম-পদবি দুটোই হুবহু মিলে যাচ্ছে! ওর সঙ্গে দত্তগুপ্তের কি কোনও যোগাযোগ ছিল?

একটা কাগজের টুকরোয় ওর ফোন নাম্বারটা টুকে নিয়ে সেটা বুকপকেটে রাখলাম।

আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও যখন আমার নাম বা ফোন নাম্বার পেলাম না তখন খানিকটা স্বস্তি পেলাম। তা হলে দত্তগুপ্তের যা-কিছু রেকর্ড ছিল সবই ওই হার্ড ডিস্কে!

কম্পিউটারে ফাইল মোছামুছির কাজ শেষ হতেই পকেট থেকে রুমাল বের করলাম। ফ্ল্যাটে ঢোকার পর থেকে যেখানে-যেখানে আমার আঙুলের ছাপ পড়েছে বলে মনে হল সেই সব জায়গা পাগলের মতো মুছতে শুরু করলাম। উত্তেজনায় মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না। কেউ যদি ফ্ল্যাটে এসে এখন আমাকে দেখতে পায় তা হলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করে খুব সাবধানে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। তারপর রুমাল দিয়ে হাতলটা ধরে পাল্লা টেনে দিতেই নাইটল্যাচ ক্লিক শব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। রাস্তায় বেরিয়েই বর্ষাকে একটা ফোন করতে হবে। তখনই বুঝব দত্তগুপ্তের বর্ষা আমার বর্ষা কি না।

কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটা ছোট্ট ভুল করে বসলাম। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে এই ভুলটা হয়তো হত না।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যখন একতলায় নামছি তখন একজন মোটাসোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা। মাথায় টাক, চর্বি-থলথলে মুখ, কোলে ভুঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে হাঁফিয়ে পড়েছেন।

আমাকে দেখে অবাঙালি টানে জিগ্যেস করলেন, 'দোত্তোগুপ্তাবাবুর ফ্লেটটা কো-তোলায় হোবে বলতে পারেন? ফোনে দোতোলা বোলল না সেকিন্ড ফ্লোর বোলল...।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাংলা তিনতলায়, ইংরেজি সেকেন্ড ফ্লোর।' তারপর ওঁর জলহস্তীর মতো চেহারা আর ঘাম-জবজবে মুখ দেখে কেমন যেন মায়া হল। বেচারা কষ্ট করে আরও কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙবে! তাই যোগ করলাম ঃ 'কিন্তু ওঁর ফ্ল্যাট তো এখন বন্ধ আছে—।'

'বোন্ধ! ইয়ে কেইসন কোম্প্‌নি? এতোটা পোথ দওড় করিয়ে...।'

হঠাৎই বুঝলাম ওঁর সঙ্গে কথা বলে ভুল করেছি। কিন্তু এখন তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ যদি দত্তগুপ্তের খুনের তদন্ত করতে-করতে এই ভদ্রলোকের খোঁজ পায় তা হলে আমার খোঁজ শুরু করতে আর দেরি হবে না।

মাথা নিচু করে তরতরে পায়ে সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম। আমার কেমন যেন দম আটকে আসছিল। একটু বাতাসের জন্যে ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিল।

॥ তিন ॥

পার্কসার্কাস ময়দানের কাছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বড়-বড় শ্বাস নিলাম। ভেতরের অস্থির ওলটপালট ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে স্থির হয়ে এল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অলস চোখে গাড়ি, বাস, অটো, ট্রাম আর লোকজন দেখতে লাগলাম।

তারপর, মন যখন পুরোপুরি শান্ত হল, তখন পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। ফোনের সুইচ অন করে বুক পকেট থেকে বর্ষার ফোন নাম্বার লেখা চিরকুটটা বের করে নিলাম। ওর নাম্বারটা ডায়াল করার আগের

BanglaBook.org

মুহূর্ত পর্যন্ত আমি মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিলাম ঃ দত্তগুপ্তের বর্ষা আর আমার অস্কার পুরস্কার বর্ষা যেন এক না হয়।

কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ও-প্রান্তে ফোন ধরে কেউ 'হ্যালো' বলল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে পার্কসার্কাস অঞ্চলটা বনবন করে লাট খেয়ে আবার কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, মাতালের মতো টলতে লাগল। কারণ, দুটো বর্ষা এক হয়ে গেছে!

আমি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করলাম। কী বলব এখন ওকে?

ও-প্রান্তে বর্ষা 'হ্যালো—হ্যালো' বলেই চলেছিল। কয়েক সেকেন্ড এলোমেলো ভাবনার পর আমি খসখসে গলায় বললাম, 'রীতেনদা বলছি। তোমার সঙ্গে এক্ষুনি খুব জরুরি দরকার আছে।'

'রীতেনদা!' বর্ষা অবাক হয়ে গেল ঃ 'আপনি আমার নাম্বার পেলেন কী করে!'

'ওসব পরে বলব। এক্ষুনি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।'

'ন্-না। বরং কাল অফিসে বলবেন।'

'বর্ষা, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দু-বছর ধরে তোমার সঙ্গে একই সেকশানে কাজ করছি—কোনওদিন তোমার ফোন নাম্বার জানতে চেয়েছি? কিন্তু এখন অ্যাবসলিউট ইমার্জেন্সি। আমাদের এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার—ফোনে এসব কথা বলা যাবে না।'

'কাল পর্যন্ত ওয়েট করা যায় না...তা হলে অফিসে...।'

আমি ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম। একটু রূঢ় গলায় বললাম, 'পি. দত্তগুপ্ত নামে কোনও ক্লিয়ারিং এজেন্টকে চেনো? পার্কসার্কাসে তিনতলায় ফ্ল্যাট...।'

'ন্-না তো, চিনতে পারছি না তো! কেন, চেনার কথা?'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সিক্রেসি আর প্রাইভেসি ছিল দত্তগুপ্তের ক্যাপিটাল। সোজা আঙুলে দেখছি ঘি উঠবে না।

অতএব আঙুল বাঁকাতে হল।

'চিনতে পারছ না! আরে যে-দত্তগুপ্ত তোমার নাম রেখেছে কঙ্কণা।'

ও-প্রান্তে চমকে উঠে শ্বাস টানল বর্ষা।

আমি আরও বললাম, 'একটা ভালো খবর আছে। দত্তগুপ্ত ঘণ্টাদেড়েক আগে ওঁর ফ্ল্যাটে মার্ডার হয়েছেন।'

'কী বলছেন, রীতেনদা!' বর্ষা একেবারে আঁতকে উঠল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এবার নিশ্চয়ই তোমার দেখা করতে কোনও অসুবিধে হবে না!'

আরও আধঘণ্টা পর, সাড়ে আটটা নাগাদ, আমি বর্ষার মুখোমুখি বসে কথা বলতে শুরু করলাম।

মৌলালির মোড়ের কাছাকাছি একটা রেস্তরাঁয় আমরা চা আর ওমলেট নিয়ে মুখোমুখি বসেছি। বর্ষা শাড়ি পরে এসেছে। তাতে ওর ধার এতটুকুও কমেনি—অন্তত আমার কাছে। কোনও রেস্তরাঁয় এই প্রথম আমরা একান্তে বসেছি। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে প্রথম এভাবে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা দারুণ হত।

আমি নিচু গলায় বর্ষাকে সব খুলে বললাম। আমার অন্যায় বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভে লজ্জায় গলা জড়িয়ে গেল, চোখে জল আসতে চাইল। বললাম, নিঃসঙ্গতায় পাগলের মতো লাগছিল আমার, মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আমাকে যেন ও ক্ষমা করে।

ক্ষমা করবে কী, বর্ষা তখন ফ্যাকাসে মুখে পাথর হয়ে বসে আছে—চোখে শূন্য দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ পর ও কথা বলল, 'রীতেনদা, কী হবে এখন!'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কোনও পথ নেই। তবে পুলিশ হয়তো দু-চারদিনের মধ্যে তোমাকে ফোন করতে পারে।'

'তখন কী বলব?'

প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। ভেতরে-ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম। কিন্তু বর্ষাকে জিগ্যেস করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছিল। আর এও মনে হচ্ছিল, ওর উত্তরটা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেবে।

'পুলিশের প্রশ্নটা যদি আমি তোমাকে জিগ্যেস করি?'

বর্ষা মাথা নিচু করে বসে রইল।

'দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে তোমার নাম আর ফোন নাম্বার পাওয়া গেল কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বর্ষা। ওর মুখ নিচু থাকায় মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যখন ও মুখ তুলল তখন ওর চোখে জল।

আমার বুকের ভেতরে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল।

বর্ষা ধীরে-ধীরে ওর কথা বলে গেল। মাঝে-মাঝে নাক টানল, রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

BanglaBook.org

দত্তগুপ্তের ব্যবসা মেয়ে নিয়ে। তবে ওঁর ব্যবসার অনেকগুলো স্তর আছে। তার একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে টেলিফোনে বন্ধুর মতো সুখ-দুঃখের গল্প করা। তারপরের স্তর টেলিফোনে নোংরা রগরগে গল্প। এর পরের ধাপে টেলিফোনে নয়—একেবারে মুখোমুখি গল্প এবং প্রেম। তবে কিছুতেই শরীর ছোঁয়া চলবে না। দত্তগুপ্তের মাস্‌লম্যানরা সেটা নজর রাখত।

এরপর আসছে বডিলাইন লেভেল। এর প্রথম লেভেলের এলাকা হল চুমু থেকে গভীর শৃঙ্গার পর্যন্ত। আর তার পরের ফাইনাল লেভেল হল ফ্রি-স্টাইল।

নানান ধরনের ক্লায়েন্টের জন্যে দত্তগুপ্তের নানানরকম ব্যবস্থা।

দত্তগুপ্তের কাছে বর্ষা প্রথম লেভেলের চাকরি করত। সপ্তাহে তিনদিন দু-ঘণ্টা করে ওকে নানা ধরনের ক্লায়েন্টের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করতে হত। এর জন্যে মাসে ও দেড় হাজার টাকা করে পেত। টেলিফোনে ওর ছদ্মনাম ছিল কঙ্কণা।

দত্তগুপ্ত ওকে বহুবারই বলেছেন প্রাথমিক স্তর থেকে ওপরের স্তরগুলোয় উঠতে। তাতে বর্ষা টাকাও পাবে অনেক বেশি। কিন্তু বর্ষা রাজি হয়নি। টাকার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে এই কাজ ও করত বটে, তবে তার জন্যে রুচি বিসর্জন দেয়নি।

টেলি-গার্ল হওয়ার চাকরিটা ও পায় ওর এক বান্ধবীর মারফত। তখন ও আমাদের কোম্পানিতে চাকরি পায়নি। খুব অভাবের সময়ে এই চাকরিটা ওকে দারুণ সাহায্য করেছে। তা ছাড়া দত্তগুপ্ত ওর সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেননি, কখনও কোনও অন্যায় প্রস্তাবও দেননি। এখন চাকরিটা চলে যাওয়াতে ওর একটু অসুবিধেই হবে।

'রীতেনদা, আপনি হয়তো আমাকে খারাপ ভাবছেন...' কান্না চাপতে-চাপতে বর্ষা কোনওরকমে বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে যা-যা বললাম সব অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। আমি শুধু টেলিফোনেই গল্প করতাম—তার বেশি কিছু নয়। তবে অনেক সময় অনেক কিছু দেখতাম...সেসব কাউকে বলা যাবে না। মিস্টার দত্তগুপ্ত এই একটা ব্যাপারে বারবার করে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন। ওঁর অনেক বাজে ধরনের লোকজন জানাচেনা ছিল। কেউ বেয়াড়াপনা করলে তাকে টিট করার ব্যবস্থা ওই লোকগুলোই করত।'

বর্ষা এখনও রুমাল ব্যবহার করে চলেছে। ওর চোখ ফুলে উঠেছে। আমি ওকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। আজ সকালেই আমরা কত দূরে ছিলাম, আর এখন কত কাছাকাছি চলে এসেছি!

BanglaBook.org

বর্ষার কাছেই শুনলাম, দত্তগুপ্ত খুব ছোট মাপে ব্যবসা শুরু করে মাত্র চারবছরেই সেটাকে বিশাল জায়গায় নিয়ে গেছেন। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ওঁর ক্লোজ কানেকশান ছিল। এসব ব্যবসায় এই টাইপের কানেকশান না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তাদেরই কেউ কি দত্তগুপ্তকে খুন করল!

বর্ষাকে আমি নানা প্রশ্ন করলাম। তার মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর ও দিতে পারল। তবে বারবার করে আমাকে বলল, 'এসব কথা যেন আমাদের দুজনের বাইরে আর কারও কাছে না যায়, রীতেনদা।'

'তুমি মিস্টার দত্তগুপ্তের কাছে কতদিন ধরে এই পার্টটাইম জবটা করছিলে?'

'অলমোস্ট দু-বছর।'

'তোমাকে স্যালারি পেমেন্ট করত কে?'

'মিস্টার দত্তগুপ্ত নিজে।'

'তুমি কোথায় বসে টেলিফোনে গল্প করতে?'

'পার্কসার্কাসের ওই ফ্ল্যাটে বসে কথা বলতাম। ওখানে একটা ঘরে পাঁচটা টেলিফোন রাখা আছে—আমরা পাঁচজন মেয়ে সেখানে বসে একসঙ্গে কাজ করতাম।'

'ওদের নাম জানো?'

'না। সবাই ছদ্মনাম ব্যবহার করত। ওরাও আমাকে কঙ্কণা নামে চিনত।'

'তোমাদের আসল নাম কে কে জানত?'

মিস্টার দত্তগুপ্ত জানতেন। আর জানতেন ওঁর পি. এ. মিস রোজি।'

'মিস রোজিকে কেমন দেখতে?'

বর্ষা মিস রোজির চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিল। সেটা আমার দেখা রিসেপশানের ওই মহিলার সঙ্গে মোটেই মিলল না।

তখন আমি রহস্যময়ী সেই মহিলার চেহারা যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে বর্ণনা করলাম। তারপর জানতে চাইলাম, 'এরকম চেহারার কাউকে তুমি ওখানে দেখেছ?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বর্ষা বলল, 'ম-ম-না।'

'যে-পাঁচজন টেলিফোনে কথা বলত তাদের দেখতে কেমন?'

'না—ওদের চেহারার সঙ্গেও আপনার ওই ভদ্রমহিলার কোনও মিল নেই।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি বললাম, 'ওই মহিলাকে পেলে অনেক কিছু জানা যেত। কে জানে, হয়তো দত্তগুপ্তকে উনিই শেষ করে দিয়েছেন...।'

BanglaBook.org

বর্ষা এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

বর্ষা একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাল আমার দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা ছিল...আমি আর ওখানে যাব না।'

'না, যেয়ো না। তবে মিস রোজিকে একটা ফোন করে বোলো যে, তোমার শরীর খারাপ। তখন উনি নিশ্চয়ই বলবেন, দত্তগুপ্ত মার্ডার হয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালালে তুমি হয়তো অনেক কিছু জানতে পারবে। সেগুলো আমাকে বোলো। দুজনে ডিসকাস করে যা হোক একটা রাস্তা খুঁজে বের করব।'

'আমরা চুপচাপ থাকি না! আমাদের ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার!'

বর্ষার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললাম, 'তোমার হয়তো ঝামেলায় না জড়ালেও চলবে, কিন্তু আমি যে অলরেডি ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। ওই মোটা ভদ্রলোক সিঁড়িতে আমাকে দেখেছেন। ফ্ল্যাটের কোথাও-না-কোথাও হয়তো আমার আঙুলের ছাপ রয়ে গেছে। এমন কী নাম আর মোবাইল নাম্বারও হয়তো কোনও খাতা-টাতা বা ডায়েরিতে লেখা আছে। পুলিশ ইনভেস্টিগেশান শুরু করলে দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমার কথা জানতে পারবে। তখন আমাকে নির্ঘাত অ্যারেস্ট করবে। মা-ভাই-বোনের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। চাকরিটাও হয়তো খোয়াতে হবে।' একটু থেমে কয়েকবার শ্বাস টানলাম আমি। ভেতরে-ভেতরে একটা গোঁয়ার্তুমি টের পাচ্ছিলাম। সেই সঙ্গে রাগও হচ্ছিল। অন্যায় ইচ্ছে নিয়ে আমি দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু কোনও অন্যায় আমি করিনি। দত্তগুপ্তকে কে-না-কে মার্ডার করেছে, অথচ সেই দায়টা চেপে যাবে আমার ঘাড়ে! বেশ মজার ব্যাপার তো! ওই ভদ্রমহিলাকে সামনে পেলে একবার দেখে নিতাম।

'না, বর্ষা—এত সহজে আমি ছেড়ে দেব না।' জেদি ঘোড়ার মতো এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম আমি ঃ 'ওই মিস্টিরিয়াস লেডিকে আমি খুঁজে বের করবই! তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারো—নাও থাকতে পারো। আই ডোন্ট মাইন্ড। আই ডোন্ট কেয়ার ইভন। দিস ইজ মাই গেম। শুধু-শুধু তোমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ট্রাব্‌ল দিলাম...।'

ভালোবাসার অস্কার নমিনি হয়ে রাস্তার মাঝে চারপাশের লোকজনের চোখের সামনে আমি বর্ষার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে পড়তে পারি। কিন্তু আমাকে অন্যায়ভাবে খুনের দায়ে কেউ জড়াতে চাইলে হাঁটুগেড়ে বসার কোনও প্রশ্নই নেই। বর্ষা পাশে না থাকতে চায় না থাক। গ্রীষ্ম তো রইল!

BanglaBook.org

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আমরা গ্রীষ্ম অনুভব করছিলাম। গুমোট চটচটে গরম। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

বর্ষা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আড়চোখে দেখল আমাকে। তারপর অপরাধী গলায় বলল, 'সরি, রীতেনদা। আপনি যা ভালো বোঝেন করুন। আমি পাশে আছি। দিস ইজ আওয়ার গেম।'

ওর কথাটা শোনামাত্রই এত আনন্দ হল যে, সম্পর্ক অন্যরকম হলে আর পরিবেশ অন্যরকম হলে ওকে একেবারে জাপটে ধরে একটা ইয়ে খেতাম।

বর্ষা আমাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনুমতি দিল। আর আমার মোবাইল নাম্বারটাও টুকে নিল।

বাড়ি ফেরার পথে মায়ের ফোন পেলাম। আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে দুশ্চিন্তায় ফোন করেছে।

মায়ের কথায় মনে-মনে হাসি পেল।

আমার দুশ্চিন্তার কথা মা যদি জানত!

॥ চার ॥

পরদিন খবরের কাগজে তিন নম্বর পৃষ্ঠায় ছোট্ট করে খবরটা ছাপা হল।

দত্তগুপ্তের পুরো নাম পিনাকী দত্তগুপ্ত। বয়েস বাহান্ন। ওঁর বেআইনি ব্যবসা মাপে বেশ বড়। পুলিশের ধারণা বখরার ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হওয়ায় অপরাধজগতের কেউ ওঁকে খুন করেছে। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে গুলি করার কারণ খুনি গুলির আওয়াজ চাপা দিতে চেষ্টা করেছে। এখনও সন্দেহভাজন কাউকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার কথা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি। কিন্তু কী করে ওই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পাওয়া যায়? দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটবাড়ির কাছে গিয়ে আমি কি তা হলে নজর রাখব? যদি ওই মহিলাকে হঠাৎ করে দেখতে পেয়ে যাই! নাকি বর্ষা যেমন বলছে, ঝামেলায় না জড়িয়ে চুপচাপ থাকব?

সারাটা দিন এইসব পাগল-করা চিন্তা নিয়ে কাটতে লাগল। মা বেশ কয়েকবার জিগ্যেস করল, কী হয়েছে। আমি প্রতিবারই পাশ কাটানো জবাব দিলাম। টের পাচ্ছিলাম, মিলি আর ব্রতীন বেশ দূরত্ব বজায় রেখে অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছে। কারণ, হাজার সমস্যাতেও ওরা কখনও আমাকে এরকম বিপর্যস্ত দেখেনি।

BanglaBook.org

সিগারেটের পর সিগারেট পুড়তে লাগল। আচমকা এরকম বিপদে জড়িয়ে পড়ে নিজেকে বেশ অসহায় লাগছিল। তবে এও মনে হচ্ছিল, এরকম ঝামেলায় না জড়ালে বর্ষাকে এতটা কাছাকাছি পেতাম না। এই কাছাকাছির আলাদা কোনও মানে আছে কি না একমাত্র ভবিষ্যৎই এর উত্তর দিতে পারে।

অফিসে গিয়ে যান্ত্রিকভাবে কাজে বসে পড়লাম। বর্ষা ওর সিটে বসে কাজ করতে-করতে বারবারই আমার দিকে দেখছিল। টিফিনের সময় ও আমার কাছে এল। চাপা গলায় বলল, 'কাগজে নিউজটা দেখেছেন, রীতেনদা?'

'দেখেছি। বোধহয় আজ সন্ধেবেলা "খাস খবর"-এ দেখাবে।'

'আজ মিস্টার দত্তগুপ্তের ওখানে ফোন করতে আমার ভয় করছে।'

'ভয়ের কী আছে! তুমি তো জাস্ট একটা ফোন করছ। সেরকম হলে ঝপ করে লাইন কেটে দেবে। আর ফোনটা করবে কোনও এস.টি.ডি. বুথ থেকে।'

বর্ষা আমার কথা শুনল বটে, তবে তেমন নিশ্চিন্ত হল বলে মনে হল না।

ওকে বললাম, সেরকম জরুরি কোনও খবর থাকলে আমাকে মোবাইলে ফোন করে জানাতে।

এমন সময় মংপু চলে এলেন আমাদের কাছে।

'বর্ষা, আই ওয়ান্ট য়ু। কাম টু মাই রুম। চেন্নাইয়ের প্রজেক্টটা নিয়ে একটু ডিসকাশন আছে।'

বর্ষা আমার দিকে একটা অসহায় চাউনি ছুড়ে দিয়ে মংপুর সঙ্গে ওঁর কাচের কিউবিক্‌ল-এর দিকে চলে গেল।

পুরকায়স্থর 'বর্ষা, আই ওয়ান্ট য়ু' কথাটা অনেকক্ষণ ধরে বেসুরোভাবে আমার কানে বাজতে লাগল। কী চমৎকার! বর্ষা, তোমাকে চাই।

বর্ষার সঙ্গে এর বেশি আর কথা বলার সুযোগ পাইনি। বেশ আনমনাভাবে অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। তারপর বর্ষার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধেটা আমার টিভি দেখে কাটছিল।

সামনে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, আর চোখ টিভির রঙিন পরদায়। কখন ফোন করবে বর্ষা? কখন?

হঠাৎই কেউ যেন চাবুকের বাড়ি মারল আমার পিঠে। একী দেখছি আমি! টিভির পরদায় সেই মুখ! সেই মহিলা! দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে আমাকে বুদ্ধু বানিয়ে কেটে পড়েছিল!

BanglaBook.org

একটা ট্যালকাম পাউডারের বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। 'ড্রিম' ট্যালকাম পাউডার লাগালে আপনার কোনওরকম অসুখ-বিসুখ করবে না, রূপকথার গল্পের মতো আপনি সারাজীবন সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবেন। দাম অত্যন্ত কম, এবং একটা কিনলে আর-একটা ফ্রি।

এরকম একটা স্বপ্নের পাউডারের বিজ্ঞাপনে সেই রহস্যময় মহিলা অভিনয় করছেন! ভদ্রমহিলার পোশাক-আশাক ও মেকাপ অন্যরকম হলেও ওঁকে চিনে নিতে আমার একটুও অসুবিধে হল না।

কিন্তু কী করে ওঁকে ধরা যায়!

কিছুক্ষণ ভেবে ঠিক করলাম ওই পাউডার কোম্পানির অফিসে যাব। সেখান থেকেই শুরু করব আমার খোঁজ।

ভদ্রমহিলার হদিস পাওয়ার পর কোথায় আমার টেনশান কমবে, তা নয়, উলটে টেনশান যেন বেড়ে গেল। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চললাম, আর বর্ষার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বর্ষার ফোন এল।

মোবাইল ফোনে 'জিঙ্গল বেল'-এর সুর বেজে উঠতেই ফোন তুলে নিলাম আমি।

'হ্যালো—।'

'রীতেনদা, বর্ষা বলছি।'

'বলো, কী খবর?'

'মিস রোজিকে ফোন করেছিলাম। বডি পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়ে পুলিশ ফ্ল্যাটটা সিল করে দিয়েছে। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখছে। ফলে ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। মিস রোজি ওঁর রেসিডেন্সের ফোন নাম্বার দিয়েছেন। বলেছেন মাঝে-মাঝে ওঁকে ফোন করে খবর নিতে।'

'গুড। এদিকে আমার কাছে তো দারুণ খবর আছে।'

'কী খবর?'

'সেই মিস্টিরিয়াস লেডিকে পেয়ে গেছি।' বর্ষাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

'এবার কী করবেন?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল ও।

'কাল ওই পাউডারের কোম্পানি দিয়ে শুরু করব। তারপর কপাল যদি গোপালপুরে নিয়ে যায়, তাও যাব। তাই এখন দু-চারদিন অফিস যাওয়াটা আমার আনসার্টেইন। আমি ফোন করে মংপুকে বলে দেব। তুমি হায়েনা আর নেকড়ের পালের মধ্যে সাবধানে থেকো।'

BanglaBook.org

'এসব ঠাট্টা এখন ভাল্লাগছে না, রীতেনদা।' তারপর একটু থেমে ঃ 'আমি কাল আপনার সঙ্গে যাব।'

একটু ভেবে আমি বললাম, 'না—এখন নয়। সময় হলে আমি বলব। তুমি বরং টাইম পেলে "ড্রিম ট্যাল্‌ক"-এর অ্যাডটা দেখো। আর দরকার মনে করলেই আমাকে মোবাইলে ফোন কোরো, ও. কে.?'

'হুঁ—' একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্ষা নিমরাজি হল।

ফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। একটা ঝঞ্ঝাটের কাজে পা বাড়ানোর আগে মনটাকে শান্ত করা দরকার।

'ড্রিম ট্যাল্‌ক' তৈরি করে 'ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড'। কয়েকটা বড়সড় স্টেশনারি দোকানে ঘোরাঘুরি করে, পাউডারের কৌটোর গায়ে লেখা কোম্পানির ঠিকানা জোগাড় করে, বি.সি.এল.-এর অফিসে পৌঁছতে খুব একটা কষ্ট হল না।

আজ সকাল থেকেই কিছুটা মেঘলা আকাশ, তাই গরমের দাপট কম। তবু বর্ষা এলে ভাল লাগত। দু-বর্ষার কথাই বলছি।

একে-ওকে জিগ্যেস করে যখন 'ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড'-এ পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় দুটো।

চিৎপুরের এক ঘিঞ্জি রাস্তায় একটা বাড়ির দোতলায় ওদের অফিস। তবে অফিস-বাড়িটার যা চেহারা তাতে মনে হতেই পারে ওরা ট্যালকাম পাউডার নয়, টুথ পাউডার তৈরি করে। নোনা-ধরা জীর্ণ বাড়ির একতলায় নানারকম কারখানা—ছাপাখানা, খাটিয়া তৈরির কারখানা, কোথাও বই বাঁধাই হচ্ছে, টিনের কৌটো তৈরি করছে কেউ। দু-তিনটে রেডিয়োর গান কানে আসছে। আর গোটা একতলাটা বিড়ি আর বাথরুমের গন্ধে ম-ম করছে।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেড়ে উঠলাম। সিঁড়ির যা ছিরি তাতে মনে হচ্ছিল তেনজিং নোরগে বোধহয় এই সিঁড়িতেই ট্রেকিং-এ হাতেখড়ি দিয়েছিলেন।

বি.সি.এল.-এর অফিসের বাইরে প্লাস্টিকের ছোট সাইনবোর্ড। তার পাশের কাচের দরজায় কোম্পানির তিনরকম প্রোডাক্টের রঙিন স্টিকার।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল। সামনের টেবিলে বসা পাকা-চুল ভদ্রলোক একটা লেজার থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোয়াল

BanglaBook.org

নড়ছিল। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের 'ট্রাইব্‌স' সিরিয়ালে বোধহয় এ-মুখ আমি দেখেছি। এ-মুখ দেখে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ডারউইনসাহেব ঠিকই বলেছিলেন ঃ বানর থেকে মানুষ। যার গাছে থাকার কথা সে একটা চেয়ারে বসে আছে। অবশ্য চেয়ার আর গাছ—দুটোই বেসিক্যালি কাঠ।

'কী চাই? পাউডার, সাবান, না ক্রিম?' কাক যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত, তা হলে বোধহয় এরকমটাই শোনাত।

ঘরের মাপ বড়জোর ছ'ফুট বাই আট ফুট। মাথায় কাঠের সিলিং। আর আসবাব বলতে একটা পেডাস্টাল ফ্যান, দুটো টেবিল, দুটো চেয়ার, আর একটা টুল। টেবিল-চেয়ারের যা রং-চটা দুর্দশা তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এদের ফাঁক ফোকরে ছারপোকার দল ওনারশিপ ফ্ল্যাট কিনে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। তবে অফিসের যা চেহারা তাতে মনে হয় না লোকজন এখানে খুব একটা আসে, আর ছারপোকাগুলো রেগুলার ব্লাড সাপ্লাই পায়।

অফিসে আর কেউ নেই। সুতরাং যা বলার এই বৃদ্ধ মানুষটিকে বলা যাক।

'আপনারা "সিসিসিএন" চ্যানেলে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন...।'

'ওই অ্যাডভেটাইজে অ্যাকশন হয়েছে তা হলে!' একগাল হাসলেন বৃদ্ধ। হাসি তো নয়, যেন দাঁতের বিজ্ঞাপন—যদিও এদিক-ওদিক কয়েকটা পিস মিসিং।

'না, মানে...আমার একটা কসমেটিক্স কোম্পানি আছে...।'

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল, ঘোলাটে চোখে সন্দেহ দেখা দিল। আমার দিকে তীব্র নজর মেলে চুপচাপ কিছু একটা চিবোনোর কাজ করে চললেন।

অনেকক্ষণ পর জিগ্যেস করলেন, 'কী তৈরি করা হয়? আমরা অনেক প্রোডাক্ট সাব-কন্ট্রাক্ট-এ তৈরি করি। লেবেল আমাদের থাকে—।'

ভদ্রলোক আমাকে এখনও বসতে বলেননি। তাই মনে-মনে বেশ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু দরকারটা আমার—তাই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিলাম। এখন ওঁর লোভ চকচকে চোখ দেখে মনে হল লোভটাকে একটু উসকে দিই।

'আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা ঘামাচির পাউডার তৈরি করছি...।'

'ঘামাচির পাউডার!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জাপানের সুঘামাচি কর্পোরেশনের সঙ্গে আমরা টেকনিক্যাল কোলাবোরেশান করেছি।'

'তা হলে তো ফরেন গুড্‌স!' খুশিতে বিকশিত হলেন বৃদ্ধ। ওঁর দাঁতে

BanglaBook.org

সূর্যমুখী দেখা গেল। বললেন, 'দারুণ! দারুণ! ওই অ্যাডভেটাইজে এই টাইপের অ্যাকশন পাব ভাবিনি।'

'আমার টোটাল প্রোডাকশন আপনাদের হাতে আমি তুলে দেব। কথা দিলাম। তবে তার আগে একটা ছোট্ট খবর চাই। আপনাদের ওই দারুণ অ্যাডটা কোন এজেন্সিকে দিয়ে করিয়েছেন? আমি ওদের দিয়ে কয়েকটা অ্যাড করাতে চাই। তাতে আপনাদের নামও দেব।'

'আরে, বসুন, বসুন।' হাতের ইশারায় আমাকে বসতে বলে বৃদ্ধ একটা পুরনো ডায়েরির পাতা হাঁটকাতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি এবং চোয়াল নাড়ার পর এজেন্সির নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিলেন। গলার স্বর যথাসম্ভব মিষ্টি করার চেষ্টা করে অনেক বড়-বড় লাভের লোভ দেখালেন আমাকে। ওঁর কথার চেয়ে গলায় স্বর আমাকে বেশি আগ্রহী করে তুলছিল। কারণ, কাক যখন কোকিলের গলায় কথা বলার চেষ্টা করে তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় সেটা জানার কৌতূহল আমার বহুদিনের।

কাজ শেষ করে পুরনো বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখি রাগী সূর্যকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেঘ কখন যেন পিঠটান দিয়েছে। গনগনে রোদে ভাজা-ভাজা রাস্তায় যখন হাঁটতে শুরু করলাম তখনও কসমেটিক্স কোম্পানির বাড়িটার বিড়ি আর বাথরুমের গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েছে।

রাস্তার ধারের একটা দোকানে বসে টিফিন করলাম। একটা ঠাণ্ডা কোক গলায় ঢাললাম। খানিকটা জিরিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম অভিযানে।

এখন যেতে হবে ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে, 'স্পেকট্রাম অ্যাড'-এর অফিসে।

বাস স্টপে একা-একা দাঁড়িয়ে যখন দরদর করে ঘামছি তখন আর-একবার মনে হল বর্ষা এলে ভালো হত। এবারও দু-বর্ষার কথাই বলছি।

'স্পেকট্রাম অ্যাড'-এর অফিসটা বি.সি.এল.-এর ঠিক উলটো। ইন্ডিয়ান মিরার স্ট্রিটে ওদের ছোট্ট অফিস। কাচ আর প্লাস্টিক দিয়ে দারুণ মড স্টাইলে সাজানো। রিসেপশান-কাউন্টারে বসে আছে ফরসা স্লিম একটি অল্পবয়েসী মেয়ে। পরনে হলুদ চুড়িদার। ওর কপালে চুলের ঝালর নেমে এসেছে। তার নীচেই টানা-টানা চোখ। মুখে একটা 'এসো-এসো' ভাব।

BanglaBook.org

এসি থাকায় ভীষণ আরাম লাগছিল। আমেজে চোখ বুজে আসতে চাইছিল। কিন্তু এখন চোখ বুজলে চলবে না। চোখ খোলা রাখতে হবে। নইলে হয়তো একেবারে বুজতে হবে—দত্তগুপ্তের মতো।

রিসেপশানের মেয়েটিকে আমার ছদ্ম-পরিচয় জানিয়ে বললাম যে, আমি একটা টিভি অ্যাড দিতে চাই। আর তাতে মডেল হিসেবে 'ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড'-এর 'ড্রিম' ট্যালকাম পাউডারের অ্যাডের মেয়েটিকে চাই।

রিসেপশানের মেয়েটি বোধহয় চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে ছিল। কারণ, আমার কথা শোনামাত্রই কাউন্টারের একপাশে বসানো কম্পিউটারের কাছে প্রায় ভেসে চলে গেল। ওর সুন্দর আঙুল ব্যস্তভাবে নড়ে উঠল কিবোর্ডে। তারপরই আমার দিকে মুখ তুলে বলল, 'আপনি ভেতরের ঘরে যান। সেখানে মিস্টার করের সঙ্গে কথা বলুন। "ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড"-এর নাম বলবেন। কম্পিউটারে দেখলাম, ওদের অ্যাডটা মিস্টার কর ডিল করেছিলেন।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে রওনা হতে যাব, ঠিক তখনই আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

পকেট থেকে ফোনটা বের করে কথা বললাম। ব্যবসার ফোন। ওরা জানে না, ব্যবসা এখন আমার মাথায় উঠেছে।

ফোনে কথা বলা শেষ করে ভেতরের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা ছোট কিন্তু চমৎকার। প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি কোনও আসবাবপত্র নেই। ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট তিনজন কর্মী—একজন মহিলা, দুজন পুরুষ—তিনটে টেবিলে বসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন। আমি ওঁদের একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে না তাকিয়েই হাতের ইশারায় সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করে চললেন।

চেয়ারটা আধুনিক—মোল্ডেড প্লাস্টিক আর লোহার কাঠামোকানুন দিয়ে তৈরি। সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের চেয়ারে বসলে এমন আরাম হয় যে, নিতম্ব নিত্যানন্দ হয়ে বারবার ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু এখন অবস্থা স্বাভাবিক নয়। তাই পেছনে পিন ফুটতে লাগল ঃ কোথায় দত্তগুপ্তের তৃপ্তি-নিকেতনের মানসী? কোথায়? কোথায়?

ভদ্রলোক কাজের ঝোঁক সামান্য কমিয়ে কয়েকটা কাগজের গোছা একপাশে সরিয়ে রেখে এই প্রথম আমার দিকে তাকালেন ঃ 'বলুন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু...।'

BanglaBook.org

'আমি মিস্টার করের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

মুখে সুন্দর পেশাদারি হাসি ফুটিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমিই সঞ্জিত কর। বলুন, কী হেল্প করতে পারি।'

'"ভারত কসমেটিক্স লিমিটেড"-এর "ড্রিম ট্যাল্‌ক"-এর অ্যাডটা আপনারা করেছেন। রিসেপশানের ম্যাডাম এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন...।'

'বলুন, কী বলবেন—।' চোখের চশমাটা সামান্য অ্যাডজাস্ট করে কর টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকালেন। ভাবটা এমন যেন আমি ওঁর কাজের সময় অকারণে নষ্ট করছি।

একটু নার্ভাস হয়ে গেলাম আমি। কিছুটা সময় নিয়ে ইতস্তত করে বললাম, 'আমার একটা ছোট কোম্পানি আছে, মিস্টার কর। তার একটা টিভি অ্যাড দিতে চাই। আর তাতে মডেল হিসেবে একজনকে আমার পছন্দ—তাকে চাই।'

সঞ্জিত কর আমার চাহিদা আঁচ করে বললেন, 'তার মানে "ভারত কসমেটিক্স"-এর "ড্রিম ট্যাল্‌ক"-এর মডেলকে চাই। ও. কে., নো প্রবলেন...।'

আমার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আমার তদন্ত তা হলে ঠিক পথেই এগোচ্ছে!

কর গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে বাঁদিকে ঘাড় ঘোরালেন। ওঁর টেবিলের পাশেই একটা সুন্দর কাঠের র‍্যাক ছিল। র‍্যাকে সার বেঁধে অনেকগুলো ভিডিয়ো ক্যাসেট সাজানো। তাদের লেবেলগুলো খুঁটিয়ে দেখে কর একটা ক্যাসেট টেনে নিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসুন, প্রোজেকশান রুমে একবার ক্যাসেটটা চালিয়ে দেখে নিই।'

কর আমাকে একটা অ্যান্টিরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভিসিআর, টিভি, প্রোজেক্টার সব তৈরি। আমাকে বসতে বলে ক্যাসেটটা রেডি করে ভিসিআর-এর 'প্লে' বোতাম টিপে দিলেন মিস্টার কর। টিভির পরদায় নানান বিজ্ঞাপনের মেলা শুরু হয়ে গেল।

একটু পরেই দেখতে পেলাম ওঁকে।

সেই বিজ্ঞাপন, সেই মুখ, সেই হাসি।

আমি একটু উত্তেজিতভাবেই করকে বললাম, 'এই ভদ্রমহিলা—এই মডেল! ওঁর নাম কী?'

'শর্মিলা বোস—গড়পাড়ে থাকেন—আমরা শর্মিলাদি বলি।' আমার দিকে খানিকটা অবাক চোখে তাকিয়ে শান্ত গলায় কথাগুলো বললেন কর।

BanglaBook.org

'ওঁর ডিটেইল্ড অ্যাড্রেসটা আমাকে দিতে পারেন?'

'কেন বলুন তো?' করের কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'না, মানে, আমার ওই অ্যাডটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতাম।' আমি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

কর হাসলেন ঃ 'যা ডিসকাস করার আমাদের সঙ্গে করতে পারেন। মডেলদের সঙ্গে ক্লায়েন্টদের জেনারালি কথা বলতে দেওয়া হয় না—তাতে কাজের প্রবলেম হয়।'

'ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যেতে পারে? জাস্ট একবার?' আমি মরিয়া।

মিস্টার কর ভালো করে আমাকে জরিপ করলেন। বোধহয় ভাবতে চাইলেন কেসটা কী ঃ প্যার কিয়া তো ডরনা কেয়া, নাকি প্রেম-প্রতিজ্ঞা?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

আমি দাগা খাওয়া প্রেমিক সাজার ভান করে মনমরা গলায় বললাম, 'কিছু মাইন্ড করবেন না। ওঁর সঙ্গে...ওঁর সঙ্গে একসময় আমার...ইয়ে, মানে...একটা অ্যাফেয়ার...মানে, পরিচয় ছিল। একবার দেখা হলে খুব ভালো হত।'

কর আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ভালো করে দেখলেন। তারপর ঠোঁটের কোণে হেসে ভিসিআর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে ভিসিআর, টিভি, সব অফ করে দিলেন।

আমি ওঁর উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম।

আপনমনেই হাসলেন কর। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। বিড়বিড় করে নিজেকেই বললেন, 'বাব্বাঃ, এই বয়েসেও শর্মিলাদিকে ইয়াং বয়ফ্রেন্ড সামাল দিতে হচ্ছে!'

তারপর আমাকে ইশারা করে অ্যান্টিরুমের বাইরে আসতে বললেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, 'শর্মিলাদি আমাদের অফিসে প্রায়ই আসেন—নতুন কাজের খোঁজ নিতে। আজও হয়তো আসবেন। সময় হয়ে গেছে।'

আমার বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ শব্দ শুরু হয়ে গেল।

'আপনার ওই অ্যাড-ফ্যাডের ব্যাপারটা তা হলে বোগাস! শুধু-শুধু আমার টাইম নষ্ট করলেন।' করের মন্তব্যে হতাশা আর বিরক্তি ছিল।

BanglaBook.org

তাই নিজের মান বাঁচাতে বললাম, 'না, না! সত্যিই একটা অ্যাড আমি তৈরি করতে চাই। ইচ্ছে হলে অ্যাডভান্স নিতে পারেন। তবে বড় অ্যাড নয়—দশ সেকেন্ডের কুইকি।'

'ঠিক আছে।' বলে আমাকে রিসেপশানের কাছে নিয়ে এলেন করঃ 'আপনি এখানে ওয়েট করুন—শর্মিলাদি হয়তো এসে যাবেন।'

রিসেপশানের সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর শর্মিলা বোসের কথা ভাবতে লাগলাম।

কী কুক্ষণে যে কৌতূহলের তাড়নায় দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম! এখন এই ঘোলাজলের ঘূর্ণি থেকে কী করে উদ্ধার পাব কে জানে! তবে লাভের মধ্যে এই হয়েছে যে, আমি আর বর্ষা দুজনেই একই বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। এর ফলে আমরা কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু বর্ষা সত্যিই আমাকে সব কথা খুলে বলেছে তো! এরকম বিপদে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। তখন যাকে-তাকে সন্দেহ হয়। আমার অবস্থাটাও বোধহয় তাই। নইলে বর্ষাকে সন্দেহ করব কেন?

একটা সিগারেট ধরাতে যেতেই রিসেপশানের মেয়েটি 'এক্সকিউজ মি, স্যার' বলে আমার দিকে তাকাল। তারপর ইশারা করল একটা স্টিকারের দিকে ঃ 'থ্যাংক য়ু ফর নট স্মোকিং'।

সিগারেট আবার পকেটের প্যাকেটে ঢুকে গেল। সিগারেট ছাড়া সময় কাটানো মুশকিল। চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসতে চাইছে।

অফিসের দরজা ঠেলে যখনই কেউ ঢুকছে তখনই আমি চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে তাকাচ্ছি। নাঃ, শর্মিলা বোস নয়।

সত্যিই, কী অদ্ভুত ব্যাপার! শর্মিলা বোসের বদলে অনেক তরুণী এবং অনেক সুন্দরী মেয়েরা 'স্পেকট্রাম অ্যাড'-এর অফিসে ঢুকলেও ওরা আমাকে একচুলও টানতে পারছে না। আমার কাছে ওরা স্রেফ নন-ম্যাগনেটিক মেটিরিয়াল। এখন, এই মুহূর্তে, শর্মিলা বোসই আমার একমাত্র মহান চুম্বক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে উঠে পড়তে হল। আড়ে তিন ঘণ্টা মতো অপেক্ষা করেও শর্মিলা বোসের দেখা পেলাম না। তখন সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঢুকে পড়লাম অফিসের ভেতরে।

সঞ্জিত করের কাছে গিয়ে কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে দাঁড়ালাম।

তিনি ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কী আর করবেন...দরকার মনে হলে কাল একবার আসুন...।'

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'আচ্ছা, ওঁর অ্যাড্রেসটা আমাকে দেওয়া যায় না? কিংবা ফোন নাম্বার?'

'উহুঁ—ট্রেড সিক্রেট।'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করাটা ভীষণ জরুরি...।'

সঞ্জিত কর ভুরু কুঁচকে সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'ইচ্ছে হলে আপনি কাল আর-একবার আসতে পারেন, চান্স নিতে পারেন। দ্য চয়েস ইজ ইওর্স। নাউ, ক্যান উই ফিনিশ দিস ডায়ালগ?'

অপমানে গা চড়চড় করছিল, কিন্তু উপায় নেই। আমার ঘাড়ের ওপর দত্তগুপ্তের ডেডবডি ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলছে।

সুতরাং 'স্পেকট্রাম অ্যাড'-এর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় রিসেপশানের মেয়েটিকে বলে এলাম যে, আমি আবার কাল আসব।

হতাশ মন নিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওনা হলাম, তখনও জানি না আর-এক বিপদ সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

॥ পাঁচ ॥

দরজার কড়া নাড়তেই মিলি দরজা খুলে দিল।

মিলি খুব ফরসা। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোয় ওকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ সরু হয়ে এল।

মিলি ফিসফিস করে বলল, 'দাদা, থানা থেকে পুলিশ এসেছে। তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।'

পুলিশ!

আমার মুখের রক্ত বোধহয় কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল, কারণ মিলির মুখে ভয়ের ছাপ পড়ল। ও অস্পষ্ট গলায় বলল, 'প্রায় একঘণ্টার ওপর ওরা বসে আছে—।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে, ঘাড়ে, গলায় বুলিয়ে নিলাম। ওঁদের প্রশ্নগুলো মনে-মনে কল্পনা করে উত্তরগুলো ঝালিয়ে নিতে লাগলাম।

'কী ব্যাপার, দাদা! পুলিশ তোর খোঁজ করছে কেন? মা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কাঁদছে।'

BanglaBook.org

আমি আপনমনেই একবার মাথা নাড়লাম। তারপর মিলিকে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। কেমন যেন দম আটকে আসছিল। একগাদা শুকনো ছাতু মুখের মধ্যে কেউ যেন জোর করে গুঁজে দিয়েছে।

বাইরের ঘরটাতেই ওঁরা দুজনে বসেছিলেন। সামনের টেবিলে দুটো খালি চায়ের কাপ আর প্লেট। তার পাশে একটা হলদে রঙের ফ্ল্যাট ফাইল।

ওঁদের একজন গাঁট্টাগোঁট্টা। পরনে ইউনিফর্ম। আপাদমস্তক পুলিশ-পুলিশ ভাব। আর-একজন সিড়িঙ্গে চেহারার। গায়ে সাদা পোশাক। গালে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। মাথায় টাক। ঠোঁটের কোণে একটা মজার হাসি সবসময় লেগে রয়েছে।

আমি ঘরে ঢুকেই ওঁদের আলতো নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'আমার নাম রীতেন মিত্র—।'

'হুঁ—বসুন।' গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার জন্যেই এতক্ষণ ওয়েট করছি।'

আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

মিলি আমার পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে চলে গেল। ও চলে যাওয়ার সময় দরজার পরদাটা কেঁপে গেল। তখনই পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মা-কে দেখতে পেলাম।

'আমি ইন্সপেক্টর সেন—মুচিপাড়া থানায় আছি।' প্রথমজন বললেন। তারপর সঙ্গীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আর ইনি কড়েয়া থানার অফিসার দ্বিজেন বিশ্বাস...।'

আমি সৌজন্য দেখালাম। তারপর প্রথম প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ইন্সপেক্টর সেন টেবিলে রাখা ফাইলটা হাতে তুলে নিলেন। সেটা ওলটাতে-ওলটাতে একটা পৃষ্ঠায় গিয়ে থামলেন।

ফাইলের দিকে চোখ রেখেই প্রথম প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন তিনি ঃ 'আপনার মোবাইল নাম্বার ৯৮৩০০-৪৩২৮১?'

'হ্যাঁ—।'

'আপনি গণেশ অ্যাভিনিউর "সফ্‌ট কর্পোরেশন"-এ প্রোগ্রামারের চাকরি করেন?"

'হ্যাঁ—।' ওরা বাড়ির কাজ বেশ গুছিয়ে শেষ করে তারপর পরীক্ষা দিতে—সরি, নিতে—এসেছে দেখছি। কিন্তু আমার মোবাইল নাম্বার ওরা কী

BanglaBook.org

করে পেল? অফিসের হদিস, বাড়ির ঠিকানা? তা হলে কি কম্পিউটার ছাড়াও অন্য কোথাও আমার মোবাইল নাম্বার আর নাম-টামের হার্ড কপি ছিল?

আমার বুকের ভেতরে এমন জোরে গুমগুম শব্দ শুরু হল যে, আমার ভয় হচ্ছিল পুলিশ অফিসাররা সেই শব্দ শুনতে পাবেন।

'পিনাকী দত্তগুপ্তকে আপনি চিনতেন?'

'না। এই প্রথম নাম শুনছি।'

'পার্কসার্কাসে ওঁর ফ্ল্যাটে আপনি কখনও যাননি?'

অসংখ্য মিথ্যে বলার জন্যে মনে-মনে তৈরি হয়ে উত্তর দিলাম, 'যাঁর নাম কখনও শুনিনি তাঁর ফ্ল্যাটে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কী করে!'

দ্বিজেন বিশ্বাস গলাখাঁকারি দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, 'সত্যিই আপনি মিস্টার দত্তগুপ্তকে চেনেন না? ওঁর ফ্ল্যাটে কখনও যাননি? কোশ্চেনটা খুব ইমপর্ট্যান্ট—উত্তরটাও।'

'কেন, ওঁকে আমার চেনার কথা?' একটু খোঁচা মেরেই প্রশ্নটা করলাম।

বিশ্বাস হাসলেন, বললেন, 'চেনার তো কথা—নইলে মিস্টার দত্তগুপ্তের ফোন থেকে আপনার মোবাইল ফোনে মেসেজ আসবে কেন!'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। ঠিক কতটা জানে ওরা?

ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার সময় চাই। তাই প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বলুন তো? পিনাকী দত্তগুপ্তকে নিয়ে এত কোশ্চেন করছেন কেন?'

এবারে সেন উত্তর দিলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'পিনাকী দত্তগুপ্ত ওঁর ফ্ল্যাটে মার্ডার হয়েছেন। কেসটা আমরা ইনভেস্টিগেট করছি। দত্তগুপ্ত একটা টেলিফোন-মধুচক্র চালাতেন। তবে আমাদের কাছে খবর আছে ব্যাপারটা এত ইনোসেন্ট ছিল না। ওঁর রোরিং বিজনেস ছিল। ক্লায়েন্টের লিস্ট ছিল কয়েক মাইল লম্বা...।'

'আর সেই লিস্টেই আমরা আপনার নাম পেয়েছি।' হেসে বললেন দ্বিজেন বিশ্বাস।

ওঁদের ভদ্রলোকের মতো সাফাই দেওয়া দরকার। তাই একটা লম্বা শ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে দত্তগুপ্তের কোম্পানির মেসেজ পাঠানোর কথা বললাম। তারপর এও বললাম যে, আমি ওঁদের ওখানে কখনও ফোনও করিনি, যাইওনি।

'বিশ্বাস করুন। —আমার মাথার ওপরে অনেক ফ্যামিলি বার্ডেন—ইনকামও তেমন নয়। এসব বিলাসিতা আমাদের মতো লোকের কাছে স্বপ্ন। অনেস্টলি বলছি।' গলায় বেশ খানিকটা আবেগ জড়িয়ে কথা শেষ করলাম।

BanglaBook.org

অফিসার দুজন কয়েক লহমা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় বুঝতে চাইলেন আমার অনেস্টিতে শতকরা জলের পরিমাণ কত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইন্সপেক্টর সেন বললেন, 'ও. কে., মিস্টার মিত্র। আজ আমরা উঠি। আপনি আমাদের না জানিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবেন না। উই হোপ য়ু আর টেলিং দ্য ট্রুথ।'

ওঁরা চলে যেতেই মা পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। আমাকে প্রায় জাপটে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর কাঁদতে-কাঁদতে ভাঙা গলায় বলল, 'রতু, রতু...আমার বড় ভয় করছে রে...।'

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, 'কোনও ভয় নেই, মা, কোনও ভয় নেই। আমি এমন কিছু করিনি যাতে পুলিশ আমার কিছু করতে পারে।'

আমার দু-হাতের বাঁধনে মায়ের ক্ষীণজীবী রোগা শরীরটা ভেজা পাখির ছানার মতো থরথর করে কাঁপছিল।

মায়ের আশঙ্কা অনুভব করে আমার চোখে জল এসে গেল।

পরদিন আবার গেলাম 'স্পেকট্রাম অ্যাড'-এর অফিসে।

গতকালের হলুদ চুড়িদার মেয়েটি আজ গোলাপি চুড়িদার পরে আছে। কপালে সেই চুলের ঝালর, তার নিচে টানা-টানা চোখ।

আমাকে দেখামাত্রই সৌজন্যের হাসি হাসল। সোফার দিকে চোখের ইশারা করল।

সোফায় বসে আমি মেয়েটিকে শর্মিলা বোসের কথা জিগ্যেস করলাম। উত্তরে মেয়েটি বলল যে, শর্মিলা বোস এখনও আসেননি—তবে ওঁর আসার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি। আমি চাইলে অপেক্ষা করতে পারি।

চাইলে মানে! শর্মিলা বোসকে আমার চাই-ই চাই! গতকালের পুলিশী হানার পর আমি রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছি। মা, ব্রতীন, মিলি যদি একবার জানতে পারে যে, দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে আমি কীসের লোভে গিয়েছিলাম, তা হলে আমাকে হয়তো সুইসাইড করতে হবে।

কী একটা কাজে সঞ্জিত কর অফিসের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রিসেপশানের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে আবার ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন, আচমকাই আমাকে দেখতে পেলেন।

'আরে, আপনি এসে গেছেন!' চওড়া করে হাসলেন সঞ্জিত কর।

BanglaBook.org

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে মাথা নাড়লাম—যার অর্থ হল, না এসে উপায় কী!

'একটু ওয়েট করুন। শর্মিলাদি আজ হয়তো আসবেন।'

সঞ্জিত করের কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে থেকে কাচের দরজা ঠেলে একজন ভদ্রমহিলা ভেতরে এসে ঢুকলেন। ফরসা গোলগাল চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, চোখে সানগ্লাস। ম্যাচ করা শাড়ি-ব্লাউজ দিব্যি মানিয়েছে।

ওঁকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না।

মিস্টার করকে দেখে খুশির হাসি হেসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'হাই সঞ্জিত, কোনও ভালো খবর আছে?'

সঞ্জিত কর বড় করে হাসলেন। তারপর আমার দিকে ইশারা করে বললেন, 'দারুণ গুড নিউজ আছে। ইওর ওল্ড ফ্রেন্ড ইজ ব্যাক। আপনি কথা বলুন। আজ আপনার সঙ্গে আমার কোনও কাজ নেই। নেক্সট মান্‌ডে বিকেলের দিকে একবার আসবেন।'

কথাগুলো বলেই সঞ্জিত কর ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা ওঁকে কোনও জবাব দিতে পারেননি। শুধু ঘাড় কাত করে 'হ্যাঁ' বুঝিয়েছেন। কারণ রিসেপশানের সোফায় আমাকে দেখেই ওঁর মুখ সাদা হয়ে গেছে। চোখ পাগলের মতো হয়ে গেছে ভয়ে।

অবশেষে আমি ওঁর দেখা পেলাম। এইবার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। দত্তগুপ্তকে কে খুন করেছে আমি জানতে চাই।

শর্মিলা বোসের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে আমি একটি কথাও বলিনি। একবার শুধু বলেছি, 'আমার নাম রীতেন মিত্র। সূর্য সেন স্ট্রিটে থাকি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। আর সেটা খুব নিরিবিলি জায়গায় হলে ভালো হয়।'

কিছুক্ষণ দোনোমনা করার পর শর্মিলা বোস ছোট্ট করে জিগ্যেস করলেন, 'আমার বাড়িতে বসে কথা বললে কোনও প্রবলেম আছে?'

'না। বরং সেটাই ভালো হবে।'

'কী করে আমার খোঁজ পেলেন?'

সংক্ষেপে সব বললাম।

তারপরই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছ থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা ছুটলাম গড়পাড়ের দিকে।

ট্যাক্সিতে শর্মিলা একবার কথা বলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে আমি ওঁকে থামিয়ে দিয়েছি। আমার মনে তখন

BanglaBook.org

শ'য়ে-শ'য়ে পাগলা ঘোড়া ছুটছে। বহু প্রশ্ন একসঙ্গে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ঠোঁটের কাছে। আমি বর্ষার কথা ভেবে মনটাকে শান্ত করছিলাম। অফিসে এখন ও কার সঙ্গে গল্প করছে কে জানে! মংপু কিংবা রেইনম্যান নিশ্চয়ই ওর কাছাকাছি আছে।

গড়পাড়ের একটা পুরনো বাড়ির একতলায় থাকেন শর্মিলা। দেড়খানা ঘরকে জোড়াতালি দিয়ে ফ্ল্যাটের মতো করে নিয়েছেন। মাসছয়েক হল বিয়ে করেছেন, তবে সিঁথিতে রঙের ছোঁয়া নেই। কারণ, যে-ধরনের কাজ তিনি করেন তাতে অসুবিধে হয়।

একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন শর্মিলা। নিজে একটা খাটো টুলের ওপরে বসলেন।

ছোট ঘর। অভাব আর চাহিদা দিয়ে সাজানো। বুঝতে পারছিলাম, ওঁর লড়াইটা বেশ কষ্টের। ওঁকে কষ্ট দিতে আমার খুব কষ্ট হবে।

আমার মুখে বোধহয় তেষ্টা আর ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। কারণ, পাশের ঘরে গিয়ে আমার জন্যে এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশের শরবত তৈরি করে নিয়ে এলেন।

কাচের গ্লাসটা হাতে নিয়ে অনুভব করে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই শর্মিলা বললেন, 'সরি, ফ্রিজ নেই।'

আমি এক ঢোঁকে গ্লাসটা খালি করে ওঁকে ফেরত দিলাম। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়েই প্রশ্ন করলাম, 'দত্তগুপ্তকে কে মার্ডার করেছে?'

শর্মিলার হাত কেঁপে গেল। গ্লাসটা মেঝেতে একপাশে রাখতে গিয়ে ঠক করে শব্দ হল। তারপর কয়েকসেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, 'আমি জানি না।'

'ম্যাডাম, এখন ছেলেমানুষীর সময় নয়। পুলিশ যে-কোনও সময় এসে আপনার বাড়ির কড়া নাড়বে—।' আমার বাড়িতে ইতিমধ্যেই হানা দিয়েছে।

'দেখুন, এখন পাঁচটা বাজে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার হাজব্যান্ড এসে পড়বে। ও খুব বদরাগী লোক। হয়তো কী-না-কী ভেবে উলটোপালটা কিছু একটা করে বসবে।'

আমি কোনও কথা না বলে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। বললাম, 'আপনি কি চান আমি এই মুহূর্তে কড়েয়া থানায় ফোন করে আপনার নাম-অ্যাড্রেস বলে দিই! তাতে আমি হয়তো মরব, তবে আপনিও বাঁচবেন না।'

শর্মিলা মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। অভিনয় কি না কে জানে!

BanglaBook.org

তবে কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে ভেজা চোখে তাকালেন আমার দিকে ঃ 'আমার অবস্থা ঠিক আপনার মতো। মিস্টার দত্তগুপ্ত সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। আমি পৌনে সাতটা নাগাদ গিয়ে দেখি উনি বিছানায় মরে পড়ে আছেন।' বিশ্বাস করুন, অনেস্ট টু গড।

'আপনাকে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়েছিল কে?'

শর্মিলা কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। ইতস্তত করে বললেন, 'রোগা ফরসা মতন একটি মেয়ে। আমাকে দরজা খুলে দিয়ে সে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল...।'

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, 'বোধহয় কোল্ড ড্রিঙ্কস আনতে গিয়েছিল। আবার সেই মেয়েটিকে খোঁজ করে যদি জিগ্যেস করি তা হলে সে-ও নিশ্চয়ই একই গল্প শোনাবে। অন্য আর-একটি মেয়ে ওকে দরজা খুলে দিয়েছিল...তারপর ওর জন্যে কোল্ড ড্রিঙ্কস আনতে গিয়েছিল।' আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম ঃ 'মিসেস বোস, ব্যাপারটা অনেকটা "মুরগি আগে, না ডিম আগে"-র মতো হয়ে গেল না! আমি লাস্টবারের মতো আপনাকে বলছি, দিস ইজ নট আ জোক। আমি আপনাকে হেল্প করতেই চাই। ডোন্ট মেক মি চেঞ্জ মাই মাইন্ড।' মোবাইল ফোনটা উঁচিয়ে ধরে ওঁকে আবার পুলিশের ভয় দেখালাম।

শর্মিলা মাথা ঝুঁকিয়ে দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। ওঁর পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। ফরসা পিঠে গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজটা যেন কেটে বসেছে।

আমি ওঁকে সামলে নেওয়ার সময় দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে শর্মিলা যা জানালেন তাতে ব্যাপারটা খুব একটা এগোল না।

শর্মিলা সত্যি-সত্যি পৌনে সাতটা নাগাদ দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন ফ্ল্যাটের দরজা খোলা—ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে শর্মিলা দরজা বন্ধ করে দেন। কারণ, দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে ওঁর যাতায়াত বহুদিন ধরেই—ফলে কোনও ভয়-টয় ওঁর মনে কাজ করেনি। রিসেপশানে কাউকে না দেখে ওঁর প্রথম খটকা লাগে। তারপর ভেতরে গিয়ে দেখেন দত্তগুপ্ত বিছানায় মরে পড়ে আছেন। ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। তখন ভীষণ ভয় পেয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোতে যাবেন ঠিক তখনই কলিংবেল বেজে ওঠে। শর্মিলা তখন ভয়ে পাগলের মতো হয়ে যান। দিশেহারা অবস্থায় কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে দরজা খোলেন।

BanglaBook.org

'তারপর তো আপনি সবই জানেন...।' ধরা গলায় বললেন শর্মিলা, 'আপনাকে চিনি না, জানি না—ঠিক কী ভাবে কথা বলব বুঝতে পারছিলাম না। ...আপনি সেদিন মিস্টার দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে কেন গিয়েছিলেন?'

ভেতরের দ্বিধা কাটিয়ে সত্যি কথাই বললাম ওঁকে। তারপর জানতে চাইলাম, 'আপনি কেন গিয়েছিলেন?'

পাশের ঘর থেকে ফোন বেজে ওঠার শব্দ শোনা গেল। শর্মিলা তড়িঘড়ি উঠে ফোন ধরতে চলে গেলেন।

একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, 'এমন প্রফেশনে আছি যে, ফোন না থাকলে চলে না। তবে খুব দরকার ছাড়া ফোন করি না। সবসময় ভয় হয়—এই বোধহয় দেড়শো ফ্রি কল পেরিয়ে গেল।'

'আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন?' ঠাণ্ডা গলায় আবার প্রশ্ন করলাম।

শর্মিলা দুবার ঢোঁক গিললেন, তারপর বললেন, 'মিস্টার দত্তগুপ্তের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ছিল।'

'কীসের বোঝাপড়া?'

শর্মিলা উদাস চোখে আমার দিকে তাকালেন। ঘরের জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির রং-চটা দেওয়াল দেখা যাচ্ছিল। দেওয়ালে বিকেলের রোদ ঠিকরে পড়ে শর্মিলার ঠিকানায় খানিকটা আলো পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সেই আলোয় শর্মিলার ফরসা গোলগাল মুখ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। আর ওর কোঁকড়ানো চুলে অসংখ্য হাইলাইটের কুচি চিকচিক করছিল।

'রীতেনবাবু, আমার জীবনটা ছোটবেলা থেকেই নানান ঝড়ঝাপটায় কেটেছে। সেসব কাহিনী আপনাকে শুনিয়ে আর লাভ নেই। পিনাকী দত্তগুপ্তের ওখানে আমি প্রায় শুরু থেকেই ছিলাম। ওঁর ব্যবসা মেয়েদের নিয়ে—তবে তার নানারকম লেভেল আছে...।'

আমি ছোট্ট করে বললাম, 'জানি—।'

'কী করে জানলেন!' শর্মিলা অবাক হয়ে গেলেন। 'জানেন, লাস্ট লেভেলে কী ধরনের কাজ করতে হয়?'

'জানি। এই তিন-দিনে আমি প্রচুর খবর জোগাড় করেছি, ম্যাডাম। পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করতে এলে আমাকে তো আগে বাঁচতে হবে! সে যাকগে—আপনি যা বলছিলেন বলুন—।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শর্মিলা তেতো গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আমি ওঁর কাছে সব লেভেলেরই কাজ করেছি ঃ টেলিফোনে খোশগল্প করা থেকে

BanglaBook.org

শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত। পরের দিকে শুধু লাস্ট লেভেলের কাজই করতাম। প্রথম প্রথম অভাবের জন্যে...শেষ দিকে হয়তো স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল...কে জানে!' শর্মিলা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'এই করতে-করতে সময় গড়িয়ে গেল, বয়েস গড়িয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, যখন জীবনটা একেবারে হোপলেস জায়গায় চলে গেছে বলে ধরে নিয়েছি, যখন সব ফুল ঝরে গেছে, তখনই আনএক্সপেক্টেড একটা ঘটনা ঘটল...।'

'কী?'

'মরা গাছে ফুল ফুটল। আই ফেল ইন লাভ। জনির প্রেমে পড়ে গেলাম।' বিষণ্ণ হাসলেন শর্মিলা ঃ 'কখনও ভাবিনি এরকম বয়েস-পেরোনো বয়েসে আমি প্রেমে পড়ে যাব—তাও আবার আমার চেয়ে কমবয়েসী কোনও পুরুষের সঙ্গে...।'

শর্মিলার মুখে ঠিকরে পড়া আলোটা ক্রমেই কনে-দেখা-আলো হয়ে যাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক অদ্ভুত ঘোরের ভেতর থেকে শর্মিলা কথা বলে চললেন।

'জনির সঙ্গে কাছাকাছি আসার পর আমার সবকিছু বদলে যেতে চাইল। ওর সঙ্গে আমার মেলামেশায় কোনও ফাঁক ছিল না। কিন্তু কোথায় ও ফূর্তি-টুর্তি করে কেটে পড়বে, তা না, আমাকে বিয়ে করার বায়না ধরল। আমার মনটাও কেমন যেন হয়ে গেল...রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু বিয়ের পর আমি কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলতেই দত্তগুপ্ত খেপে গেলেন। জনি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সিকিওরিটি অফিসারের চাকরি করে। আর টুকটাক মডেলিং করে আমিও দু-পয়সা আয় করি। ফলে সংসার চালাতে কোনও প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। সেইজন্যেই ওসব কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দত্তগুপ্ত পরিষ্কার আমাকে বললেন, "একটা কেন, দশটা বিয়ে করো—তবে লাইন ছাড়তে পারবে না। আমার বিজনেসের ক্ষতি হবে।"

'দত্তগুপ্ত এমনিতে ভালো লোক ছিলেন—কিন্তু বিজনেসের এক ইঞ্চি ক্ষতি হলেই রাগে পাগল হয়ে যেতেন। আমাকে তো ঘরে ডেকে নিয়ে যা-তা বললেন। যখন দেখলেন আমি সেই এক গোঁ ধরে আছি, তখন বিচ্ছিরিভাবে হেসে একটা বড় খাম বের করলেন। খামের ভেতরে ছ'ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি মাপের অনেকগুলো কালার ফটোগ্রাফ ছিল। নানান ধরনের কাস্টমারের সঙ্গে আমার ছবি—সবই বেডরুমের...একটাতেও গায়ে সুতো নেই।

BanglaBook.org

'আমি তাতে ভয় পাইনি। কারণ, জনি আমার এই লাইফের কথা জানত। সব জেনেই ও আমাকে বিয়ে করেছে। তাই জোর গলায় দত্তগুপ্তের হুমকির প্রতিবাদ করি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখের হাসি হাসলেন শর্মিলা। ছোট করে মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। তারপর বললেন, 'দত্তগুপ্তকে চিনতে আমি ভুল করেছিলাম। উনি আমার কথায় দমে না গিয়ে হেসে বললেন, "শর্মিলা, তুমি বড় ছেলেমানুষ। প্রেম-টেমের ব্যাপারগুলো আমি বুঝি। এই ছবিগুলো আমি তোমার হাজব্যান্ডের কাছে পাঠাব না। ছাপিয়ে বই করে পর্নোগ্রাফির মার্কেটে বিক্রি করব। এত কম দামে বেচব যাতে কয়েকমাসে লক্ষ-লক্ষ কপি উবে যায়। তাতে ছবির সঙ্গে-সঙ্গে তোমার নাম-ঠিকানাও ছাপা থাকবে। কনট্যাক্ট ফোন নাম্বার, আর পার-নাইট রেটও ছাপা থাকবে। তোমার সোসাল লাইফ বলে কিছু থাকবে না। শুধু থাকবে অ্যান্টিসোসাল লাইফ।"

'এরপর দত্তগুপ্ত প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁর ফ্ল্যাট থেকে ফিরে এসেছিলাম। তার পরে বহুবার ওঁকে রিকোয়েস্ট করেছি—কিন্তু ওঁকে নড়াতে পারিনি। তখন বাধ্য হয়ে আমি নানাভাইয়ের কাছে যাই...।'

'কে নানাভাই?' আমি জিগ্যেস করলাম।

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে একবার দেখলেন শর্মিলা। তারপর ঢোক গিলে বললেন, 'মিস্টার দত্তগুপ্তের এলাকাটা ওঁর দখলে। দত্তগুপ্ত মাসে-মাসে নানাভাইকে দশহাজার টাকা করে দিতেন।'

'নানাভাইয়ের কাছে আপনি কবে গিয়েছিলেন?'

'লাস্ট মান্থে।'

'তারপর?'

'নানাভাইকে আমি চিনতাম। দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটেই একবার আলাপ হয়েছিল। আমার কথা শুনে নানা বললেন, "কোনও চিন্তা নেই। সব প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যাবে।" তারপর...।'

'নানাভাইকে আপনি কোনও টাকা দিয়েছিলেন?'

'না, না! কোনও টাকা দিইনি।'

'নানাভাই কীভাবে প্রবলেম সল্‌ভ করবেন বলেছিলেন?'

'না—বলেননি।'

তা হলে কি নানাভাই সবচেয়ে সোজা-সরল পথে প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দিয়েছেন! দত্তগুপ্তের মুখের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে তারপর...।

BanglaBook.org

হঠাৎই শর্মিলা বললেন, 'নানাভাই মহিলাদের খুব রেসপেক্ট করেন। আমার অবস্থার কথা শুনে ছোট্ট করে শুধু বলেছিলেন, "ম্যাডাম, আপনার কথা যদি সাচ্চা হয় তা হলে ওই বাস্টার্ডটার আমি কাম তামাম করে দেব। আর যদি খোঁজ নিয়ে দেখি আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন, তা হলে আমার ছেলেরা আপনাকে পাবলিক প্লেসে বেইজ্জত করে ছাড়বে।" তখন...তখন আমি কেঁদে নানাভাইয়ের পা জড়িয়ে ধরি...।'

'কিন্তু আপনি এটা খেয়াল করেছেন, দত্তগুপ্তকে মার্ডার করলে নানাভাইয়ের মান্থলি ইনকাম দশহাজার টাকা করে কমে যাবে!'

'হ্যাঁ জানি। সেইজন্যেই তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না...দত্তগুপ্তকে কে মার্ডার করল...আপনি আমাকে ফর নাথিং সন্দেহ করছেন।'

আমার মনের ভেতরে একটা ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছিল। এ কোন জটে জড়িয়ে পড়লাম আমি! বর্ষার কথাটা মনে পড়ল ঃ 'আমরা চুপচাপ থাকি না! আমাদের ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার!'

আমি কি তা হলে ভুল করছি?

'আপনি এখন কী করতে চান?' শর্মিলার আচমকা প্রশ্নে আমি চমকে উঠলাম।

সত্যিই তো! এখন কী করব আমি? কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, পুলিশ বরং পুলিশের কাজ করুক। আমি আর বর্ষা চুপচাপ থাকি। যদি পুলিশ তদন্ত করতে-করতে আমাকে কিংবা বর্ষাকে অ্যারেস্ট করে হ্যারাস করে, তখন না হয় কিছু একটা করা যাবে। দরকার হলে নানাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বিপদের কথা বলব।

'নানাভাইয়ের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিতে পারেন?'

'কেন, কী করবেন?' শর্মিলা যেন ভয় পেয়ে গেলেন।

'ফোন নাম্বার নিয়ে লোকে কী করে—ফোন করে। আমিও তাই করব। নানাভাইয়ের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন।' আমার শেষ কথাটায় একটু কড়া সুর ছিল।

শর্মিলা আমার চোখে কী যেন দেখলেন। তারপর তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে একটা ডায়েরির পাতা উলটে নানাভাইয়ের ফোন নাম্বারটা আমাকে বললেন। আমি মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে নাম্বারটা টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ঢুকিয়ে নিলাম।

শর্মিলা তখন আমার মোবাইল নাম্বারটা চাইলেন। দিলাম। এবং ওঁর ফোন নাম্বারটাও মোবাইল ফোনে স্টোর করে নিলাম।

BanglaBook.org

'মিস্টার দত্তগুপ্ত মার্ডার হওয়ার পর আপনি নানাভাইয়ের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি?'

'না—' শর্মিলা ইতস্তত করে জবাব দিলেন, 'পুলিশের অ্যাক্টিভিটিটা একটু থিতিয়ে আসুক...তারপর হয়তো কনট্যাক্ট করব।' শর্মিলা আবার হাতঘড়ি দেখলেন। কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার উঠুন, প্লিজ। জনি এখুনি এসে পড়বে। তারপর...।'

মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'ম্যাডাম, চলি। থ্যাঙ্ক য়ু ফর ইয়োর কোঅপারেশন।'

শর্মিলা বোস ভদ্রতার হাসি হাসলেন, বললেন, 'আপনার খোঁজখবরে নতুন কোনও ডেভেলাপমেন্ট হলে আমাকে জানাবেন। দরকার হলেই বলবেন —আমি সবসময় হেল্প করতে রাজি আছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন দশাসই চেহারার লোক হুট করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। তাকে দেখে শর্মিলার মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওঁর ফরসা মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। একবার আমার দিকে, একবার আগন্তুকের দিকে সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে লাগলেন। যেন এক্ষুনি কোনও বিপদ হতে পারে।

ঘরে যে ঢুকেছে তার হাবভাবে একটু মালিক-মালিক ছাপ রয়েছে। গায়ের রং রোদে পোড়া তামাটে। চৌকো মুখে অকালে ভাঁজ পড়েছে। কপালে কিছু বেশি। ছোট-ছোট চোখে ঘোলাটে ভাব। চোখের নীচে অ্যালকোহলের ব্যাগ। আর ঠোঁটে কালচে ছোপ। নাকটা পেশাদার বক্সারদের মতো চ্যাপটা। মাথার কালো কুচকুচে চুল তেল মেখে পেতে আঁচড়ানো।

বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। পরনে ঘিয়ে রঙের হাওয়াই শার্ট আর নস্যি রঙের ফুলপ্যান্ট। জামাটা ঢোলা হলেও পেশি আর স্বাস্থ্য এখানে-সেখানে জানান দিচ্ছে।

'আমার হাজব্যান্ড—জনি।' মুখে চেষ্টা করে হাসি ফুটিয়ে শর্মিলা বললেন।

মুখটা চিনতে পারলাম। কারণ, দেওয়ালে টাঙানো একটা রঙিন ফটোগ্রাফে জনি ওর এক রোগাপটকা বন্ধুর সঙ্গে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি হেসে হাত বাড়ালাম জনির দিকে। জনি হাসল। ওর মুখের রুক্ষ সন্দিহান ছাপটা কেটে গেল। আমার সঙ্গে হাত মেলাল।

ওকে উইশ করে আমার পরিচয় দিলাম। তারপর আর কিছু বলার

BanglaBook.org

আগেই শর্মিলা বলে উঠলেন, 'মিস্টার মিত্র একটা অ্যাড ফিল্মে আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান। আজ বিকেলেই "স্পেকট্রাম অ্যাড"-এর অফিসে ওঁর সঙ্গে কনট্যাক্ট হয়েছে।'

ইশারা থেকে বুঝে নেওয়া বুদ্ধিমান লোকের কাজ। তাই একগাল হেসে বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই ওয়েট করছিলাম। ম্যাডাম বলছিলেন যে, আপনি এখুনি এসে পড়বেন...।'

জনি একটা মোড়া টেনে নিয়ে আমাদের কাছাকাছি বসে পড়ল। অনুরোধের সুরে বলল, 'অ্যাডের কাজ-টাজের খোঁজ পেলে ওকে দেবেন। ওর মধ্যে পার্টস আছে—কিন্তু ভালো চান্স পায়নি। তবে যারাই ওকে দিয়ে কাজ করিয়েছে দে গট হুক্‌ড। হোয়াট ডু য়ু সে, হানি?' জনি হো-হো করে হেসে উঠল।

হাসতে-হাসতে হঠাৎই ওর খেয়াল হল আমি দাঁড়িয়ে আছি। তাই বলল, 'আপনি বসুন না—' শর্মিলার দিকে ফিরে ঃ 'ওঁকে চা-টা দিয়েছ?'

শর্মিলা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, 'আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে—আর বসব না। আজ চলি—পরে আবার দেখা হবে।'

শর্মিলা আমাকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

হঠাৎই একটা কথা মনে পড়ায় ওঁকে জিগ্যেস করলাম, 'ম্যাডাম, দত্তগুপ্ত কি চুরুট খেতেন?'

আচমকা এই ধরনের প্রশ্নে শর্মিলা কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে মিস্টার দত্তগুপ্তকে যেন চুরুট খেতে দেখেছি।'

আমার কপালে ভাঁজ পড়ল। কী যে করি এখন! এভাবেই কি আমাকে আঁধারকানা হয়ে ঘুরে-ঘুরে মরতে হবে! বর্ষা যদি ফোন করে তা হলে ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখি।

শর্মিলাদের ঘর থেকে আবছাভাবে ইংরেজি গানের কলি ভেসে আসছিল। জনি গান গাইছে। তারপরই নাম ধরে স্ত্রীকে ডাকল জনি। একবার। দুবার।

শর্মিলা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। তারপর ব্যস্তভাবে বললেন, 'যাই—পরে আপনাকে ফোন করব। আপনিও দরকার হলে ফোন করতে পারেন। দুপুরে করবেন—জনি তখন থাকবে না।'

আবার রাস্তার আমার সঙ্গী হল। তবে সূর্যের পালা এখন শেষ। একটু পরেই চাঁদের পালা শুরু হবে।

BanglaBook.org

॥ ছয় ॥

বাড়ি ফেরার পর আমার ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে মা আঁতকে উঠল। কয়েক লাইন বকুনি দিয়ে তারপর গজগজ করতে-করতে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। প্রায় শাসনের সুরে বলল, 'এবার একটু বিশ্রাম কর। বাড়ি থেকে আর বেরোস না।'

মা কথাগুলো না বললেও পারত। কারণ, আমার শরীর আর বইছিল না। নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলাম। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে ঝড় তুলতে লাগল। তারই মধ্যে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল মোবাইল ফোনের সুরেলা আওয়াজে।

ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ঘর অন্ধকার। মোবাইল ফোনটা টেবিলে রাখা ছিল। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে সেদিকে এগোতে-এগোতেই ফোনের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। ইস, বোধহয় বর্ষার ফোন ছিল।

আলো জ্বেলে মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে 'মিস্‌ড কল'-এর লিস্টে ফোন নাম্বারটা দেখলাম। না, বর্ষার নাম্বার নয়। আমার চেনা অন্য কোনও নাম্বারও নয়।

এরপর সিগারেট, চা, আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সময় কাটতে লাগল। একসময় আর পেরে না উঠে টেপ রেকর্ডারে গান চালিয়ে দিলাম। ধীরে-ধীরে দত্তগুপ্ত, শর্মিলা, জনি, নানাভাই, সবাই আবছা হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু বর্ষার ফোন এল না।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আর থাকতে না পেরে বর্ষাকে ফোন করলাম। বোধহয় ওর মা ধরলেন। ধরেই প্রশ্ন করলেন, 'কে বলছেন?'

আমি নাম বললাম।

'বর্ষা এখন নেই। একটু কাজে বেরিয়েছে। আপনি কাল সকাল আটটা নাগাদ ফোন করবেন—পেয়ে যাবেন।'

ফোন শেষ হওয়ার পর বেশ ধন্দে পড়ে গেলাম। এত রাতে কোন কাজে বেরিয়েছে বর্ষা! দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়ে কোনও বিপদে পড়ল না তো! নাকি মিস রোজির বাড়িতে গেছে!

পরদিন অফিসে গিয়ে আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।

অন্যান্য অস্কার নমিনিকে উপেক্ষা করে বর্ষা সরাসরি চলে এল আমার কাছে। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'রীতেনদা, কাল আপনি ফোন করেছিলেন? আমি তখন কড়েয়া থানায় গিয়েছিলাম—।'

BanglaBook.org

শুনে আমার ফ্যাকাসে হওয়ার পালা।

'থানায়! তার মানে!'

ও নিচু গলায় সব বলল।

কড়েয়া থানা থেকে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। পাড়ার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে ও থানায় দেখা করতে গিয়েছিল। বর্ষা জানত, সন্ধের পর কোনও মহিলাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে থানায় ডেকে পাঠানো যায় না। কিন্তু কৌতূহল ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে পুলিশকে ও যা বলার বলেছে। এও বলেছে, খুনের ব্যাপারে ও কিছু জানে না। পুলিশের ধারণা, দত্তগুপ্তকে কেউ বদলা নেওয়ার জন্যে খুন করেছে। কোনও মাফিয়া ডনও খুনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে।

'আচ্ছা, বর্ষা, মিস্টার দত্তগুপ্ত কি চুরুট খেতেন?'

আমার আচমকা প্রশ্নে ও থতমত খেয়ে গেল, বলল, 'না তো! উনি ক্লাসিক খেতেন। মিস রোজিকে একদিন আমার সামনেই প্যাকেট বের করে অফার করেছিলেন—আমি দেখেছি।'

আমার মনের ভেতরে ঝড় উঠল। হে নিয়তি, এ তোমার কেমন খেলা!

বর্ষা চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'আপনার ছুটোছুটির কী রেজালট হল?'

'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।' হেসে বললাম, 'এখন নয়। এক্ষুনি পুরকায়স্থ তোমাকে তলব করে বসবে। চলো, আজ বাইরে লাঞ্চ করব। তখন সব বলব...।'

বর্ষা ঘাড় কাত করল। ওর শ্যাম্পু করা চুল বিজ্ঞাপনের মতো দেখাল।

আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছিলাম, হঠাৎই দেখি প্রকাশ রায়চৌধুরী হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বর্ষাকে বললাম, 'বর্ষা, এবার একটু প্রকাশের কাছে যাও—বৃষ্টি দাও। নইলে ওর চোখ-মুখের যা হিংস্র অবস্থা দেখছি তাতে সামনে যাকে পাবে তাকেই কামড়ে দেবে।'

এত সমস্যার মধ্যেও বর্ষা হাসল। হেসে সত্যি-সত্যিই চলে গেল প্রকাশের টেবিলের কাছে।

আমি মাথা নিচু করে কাজে মন দিলাম। প্রেমে গদগদ হায়েনাকে কেমন দেখায় সেটা আমি আর দেখতে চাই না।

* * *

BanglaBook.org

রশিদ আমাকে পথ দেখিয়ে নানাভাইয়ের আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর লম্বা-লম্বা চুল, ভাঙা গাল, লিকলিকে ঢ্যাঙা চেহারা দেখলে কে বলবে ও নানাভাইয়ের হিটম্যান—দু-চারটে খুন ওর কাছে কোনও ব্যাপার নয়!

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে ছাতা নেই। তাই দুজনেই অল্পবিস্তর ভিজতে-ভিজতে কাদা-জল মাড়িয়ে একটা বস্তির সরু গলি ধরে এগোচ্ছিলাম। কলকাতার কোনও গলিতেই ভদ্রলোকের মতো আলো নেই। এখানেও তাই। কলকাতা চিরকালের জন্যে উন্নয়নশীল রয়ে গেল! সত্যি-সত্যি যদি কোনওদিন কলকাতার উন্নতি ঘটে যায়, তা হলে এখানে উন্নয়নশীল কাজকর্ম যেসব জনগণঅন্তপ্রাণ মহাজন করে থাকেন তাঁরা নিতান্ত বেকার হয়ে পড়বেন।

নানাভাইয়ের অট্টালিকার সামনে পৌঁছে বুকের ভেতরটা ভয়ে মুচড়ে উঠল। বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার এই পদ্ধতিটাই যে কেন আমার সবচেয়ে পছন্দ হল কে জানে! ভয় তাড়াতে বর্ষার কথা ভাবতে শুরু করলাম।

পরশুদিন বর্ষার সঙ্গে বিস্তর আলোচনার পর মনে হল, নানাভাইয়ের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে। আমাকে পুলিশ হাজতে পুরে থার্ড ডিগ্রি দেওয়ার আগে আসল খুনিকে ধরা চাই। আর সেটা নিশ্চয়ই রীতেন মিত্রের কর্ম নয়! অতএব নানাভাই।

গতকাল শর্মিলাকে ফোন করেছিলাম। আমার নাম বলামাত্রই তিনি যে-ধরনের হাসি হাসলেন তাতে যে-কোনও লোকের মনে হতে পারে "স্পেকট্রাম অ্যাড"-এর সঞ্জিত করের ধারণাটাই ঠিক। আবার দত্তগুপ্ত বেঁচে থাকলে বলতেন, শর্মিলা বোস ফার্স্ট লেভেলের কাজ করছে।

'কেমন আছেন, ম্যাডাম?'

'ভালোই। আপনি?'

'আপাতত ঠিক আছি—তবে আপনার হেল্প না পেলে আমার ফিউচার টেন্‌স হতে পারে। আর তাই নিয়েই ভীষণ টেনশানে আছি।'

'বলুন, কী হেল্প করতে হবে—।'

'নানাভাইকে একটু কনট্যাক্ট করতে চাই। আপনি ফোন নাম্বার দিয়েছেন ঠিকই—তবে ডায়রেক্টলি ফোন করাটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'নানাভাইকে ফোন করে আপনি কী বলবেন?'

আবার সেই একই প্রশ্ন! শর্মিলা কি চান না আমি নানাভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি? কিন্তু শর্মিলা তো এও জানেন, আমাকে হেল্প না করে ওঁর উপায় নেই। আমি পুলিশের ঝামেলায় জড়ালে উনিও রেহাই পাবেন না। তাতে হয়তো জনির সঙ্গে ওঁর প্রেমের বিয়েটা চটকে যাবে।

BanglaBook.org

একটু হেসে বললাম, 'আমি মহিলা হলে কোনও প্রবলেম ছিল না। কারণ, আপনিই তো বলেছেন নানাভাই মহিলাদের খুব রেসপেক্ট করেন। কিন্তু পুরুষদের কী করেন? পিনাকী দত্তগুপ্তের মতো কাম তামাম করে দেন?'

শর্মিলা কিশোরীর মতো হেসে উঠলেন ঃ 'দত্তগুপ্তের সঙ্গে আপনার কোনও তুলনা চলে না।' একটু থেমে আদুরে গলায় বললেন, 'আপনি দারুণ অ্যাট্রাকটিভ।'

আমার হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা আর-একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। আমাকে এইরকম ভালো-ভালো কথা বলার জন্যে শর্মিলা পরে হয়তো সেল ট্যাক্সসমেত বিল পাঠাবেন।

'ম্যাডাম, প্লিজ। আমার অবস্থাটা একবার বুঝুন। নানাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

শর্মিলা তখন আমাকে রশিদের কথা বলেন। ওর ফোন নাম্বার দেন। তারপর ঃ 'রশিদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি ওকে ফোন করে আপনার কথা বলে দিচ্ছি। আপনি আধঘণ্টা পরে ওকে ফোন করুন। তবে খুব কেয়ারফুলি কথাবার্তা বলবেন। ও নানাভাইয়ের একনম্বর হিটম্যান।'

যখন টেলিফোন ছাড়তে যাচ্ছি তখন শর্মিলা আবার জানতে চাইলেন, নানাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আমি কী করব।

মনে-মনে ভীষণ বিরক্ত হলেও মিষ্টি গলায় উত্তর দিলাম, 'নানাভাই কেমন আছেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেমন আছে, সে-কথা জিগ্যেস করব। তারপর জানতে চাইব, দত্তগুপ্তকে মার্ডারের গুপ্তকথা।' একটু হেসে যোগ করলাম ঃ 'পরে আপনাকে সব জানাব।'

এবং রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

টিন ও টালির তৈরি খুপরি গোছের বেঁকাতেড়া ঘরগুলোর প্রায় গা ঘেঁষে জিরাফের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নানাভাইয়ের প্রাসাদ। বস্তির কারুকার্যের পাশে শ্রাবস্তীর কারুকার্য বড়ই বেমানান ঠেকছিল।

কোলাপসিব্‌ল গেটের সামনে জোরালো আলো জ্বলছিল। ভেতরে একটা ঘরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ছিল। লোকজনের চাপা কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসছিল।

রশিদ পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল। চাপা গলায় কী সব কথা বলল। তারপর আমাকে হাত নেড়ে ইশারা করল ঃ 'যাইয়ে, অন্দর যাইয়ে, ডাঁয়ে তরফ কা বড়া কামরা। পহেলে আপনা নাম বতানা—নানাভাই সমঝ জায়েঙ্গে।'

BanglaBook.org

রশিদের নির্দেশ মতো ভেতরের দিকে পা বাড়ালাম। ভয়ে ঠকঠক করে পা কাঁপার ব্যাপারটা যে নেহাতই কথার কথা নয় সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছিলাম। বেশ কষ্ট করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ডানদিকের একটা বড় ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরজার গ্রিলের পাল্লা হাট করে খোলা। তারপর কাঠের পাল্লা। হয়তো বাড়তি নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা। যারা মানুষের কাছে ভয় ফিরি করে বেড়ায় তারাও তা হলে ভয় পায়!

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই শৌখিন আতর আর মদের গন্ধ আমার নাকে ঝাপটা মারল। একেবারে পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে কাচে ঢাকা বড়সড় এক্সিকিউটিভ টেবিল। তার ওপিঠে গদিমোড়া ঘূর্ণি চেয়ার। তাতে শরীর এলিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে যিনি আয়েসী ঢঙে বসে আছেন তিনিই বোধহয় নানাভাই।

মাথায় শতকরা নব্বই ভাগ মরুভূমি। মাথার পেছনদিকটায় আর কানের পাশে ছিটেফোঁটা মরূদ্যান। গায়ের রং কালো। বছর পঞ্চাশের থলথলে মুখ। ঠোঁটের ওপরে কাঁচাপাকা গোঁফ আর কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। দাড়ির নীচেও চিবুকের ভাঁজ চোখে পড়ছে।

নানাভাইয়ের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। গলায় পাহাড়ী কাঁকড়াবিছের লেজের মতো মোটা সোনার চেন। ডান হাতের ডুমো-ডুমো আঙুলে চারটে পাথর বসানো ভারি সোনার আংটি। ডানহাতের কবজিতে সোনার রিস্ট ব্যান্ড।

নানাভাইয়ের সামনের টেবিলে দুটো মোবাইল ফোন পড়ে আছে। তার পাশে কাটগ্লাসের নকশা তোলা গ্লাসে নেশা টলটল। তার কাছাকাছি নেশার বোতল, সোডার বোতল, চিকেন পকোড়ার প্লেট, আর পাঁচশো পঞ্চান্ন সিগারেটের প্যাকেট।

টেবিলে আরও চোখে পড়ল একটা ডায়েরি, তিনটে পেন, আর ডানদিক ঘেঁষে একটা পারসোনাল কম্পিউটার।

ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে বসানো রয়েছে একটা এয়ারকুলার মেশিন। কিন্তু মেশিন বোধহয় খারাপ—তাই তিনটে সিলিং পাখা ঘুরছে।

নানাভাইয়ের টেবিলের এদিকটায় চারটে গদিমোড়া চেয়ার—গেস্টদের জন্যে। সেখানে মাঝারি চেহারার একজন বসে ছোলা বা বাদাম কিছু একটা চিবোচ্ছে। এ ছাড়া দরজার ডানদিকে লম্বা গদিওয়ালা বেঞ্চে দুজন লোক বসে

BanglaBook.org

রয়েছে। ওদের চেহারা আর হাবভাব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা নানাভাইয়ের 'ছেলে'। ওদের মধ্যে একজনকে কেন জানি না, চেনা-চেনা মনে হল।

আমি ইতস্তত পায়ে এগিয়ে গেলাম নানাভাইয়ের টেবিলের কাছে। টের পেলাম নানার 'ছেলে'দের একজন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই তার ডান হাত পকেটে ঢোকানো এবং সতর্ক নজরে আমার গতিবিধি লক্ষ করছে।

'আ-আমার নাম রীতেন মিত্র...।'

মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে নানাভাই হাসলেন। ওঁর ফোলা ফোলা গাল আরও ফুলে উঠল। বললেন, 'আসুন, আসুন—বসুন—। রশিদ আপনার ব্যাপারে আমাকে বলছিল।'

ওঁর কথায় সামান্য টান টের পাওয়া গেল।

আমি বসলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। আতর আর মদের গন্ধ নাক অবশ করে দিচ্ছিল। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কী!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বললাম, 'নানাভাই, একটা প্রবলেমে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'প্রবলেমে না পড়লে আমার গরিবখানায় কেউ আসে না।' হাসলেন নানা ঃ 'বলুন, কী প্রবলেম?'

আমি তখন পিনাকী দত্তগুপ্তের খুনের ব্যাপারটা বললাম। বললাম, পুলিশ আমাকে একবার ইন্টারোগেট করেছে—আবার করতে পারে। ওরা বোধহয় মার্ডারটার ব্যাপারে আমাকেই সন্দেহ করছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হয়তো আমাকেই অ্যারেস্ট করবে। তবে বর্ষা কিংবা শর্মিলা বোসের কথা বললাম না।

'কড়েয়া থানার কে আপনাকে হ্যারাস করছে? মুখার্জিবাবু? দাসবাবু?'

আমি তখন ভয় পেয়ে বললাম যে, না, এখনও ঠিক হ্যারাস করেনি। তবে আচমকা হয়তো অ্যারেস্ট পারে। আমি একজন সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রামার—কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। এসব ব্যাপার লোক-জানাজানি হলে আমি লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।

ইচ্ছে করেই নানাকে ইন্সপেক্টর বিশ্বাসের নাম বললাম না।

নানা গ্লাসে চুমুক দিলেন, চেয়ারের হাতলে বারকয়েক টোকা মারলেন। কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

আমি আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'নানাভাই,

BanglaBook.org

দত্তগুপ্তকে কি আপনি...মানে, আপনার কোনও লোক কি ইয়ে...মানে, মার্ডার করেছে?'

নানাভাইয়ের চিন্তার ঘোর কেটে গেল। আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। দেখাদেখি ওঁর তিন শাগরেদও হাসতে শুরু করল।

আমি ফ্যালফেলে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো বসে রইলাম। মনের মধ্যে অপমানবোধ খোঁচা মারছিল।

কিছুক্ষণ পর হাসির দমক কমলে, নানাভাই বললেন, 'আপ বড়া ভোলা সাদাসিধা আদমি হ্যায়, মিত্তিরবাবু। আমার এরিয়ায় বা ক্লায়েন্টদের কানেকশানে অন্য এরিয়ায় মাসে আমাকে দু-পাঁচ-দশটা বডি ফেলতে হয়। কবে কোন বডি ফেলেছি তার ডিটেইল্‌স কি মুখে-মুখে বলা যায়! কী নাম বললেন যেন?'

আমি পিনাকী দত্তগুপ্তের নাম-ঠিকানা আবার বললাম।

'হিকপিক—।'

এই বিচিত্র শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে চেনা-চেনা মনে হওয়া 'ছেলে'টি 'ইয়েস বস' বলে নানার টেবিলের কাছে এগিয়ে এল।

বুঝলাম, হিকপিক ওর নাম। আচার্য সুনীতিকুমার বেঁচে থাকলে এই নামের উৎপত্তি এবং ব্যুৎপত্তি নিয়ে হয়তো একটা নিষ্পত্তি করে ফেলতেন।

'হিকপিক, জেরা দেখ তো, ইয়ে ডায়েরিমে ইয়া কম্পুটারমে উও পিনাকী দত্‌গুপ্‌কা বডিকা হিসাব হ্যায় কি নহি...।'

হিকপিক নানার টেবিল থেকে ডায়েরিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। তারপর একমনে পাতা ওলটাতে লাগল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে নানাভাই আমার পাশে বসা ছোলা-কিংবা-বাদাম-চিবোনো লোকটার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

হিকপিকের ডায়েরি দেখা শেষ হল। আপনমনেই এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে ও বলল, 'ডায়েরিমে তো নহি মিলা, বস। অব দেখতে হ্যায় কম্পুটারমে...।'

হিকপিকের লিকপিকে রুক্ষ চেহারা দেখে ওকে ভিখিরি ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অথচ এই লোকটা লেখাপড়া জানে, কম্পিউটার অপারেট করতে পারে! আমি ওকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম।

কম্পিউটারে মিনিটখানেক বোতাম টেপাটিপির পর হিকপিক বলল, 'হমারা ক্লায়েন্ট থা, বস। মাহিনামে দশহাজার...।'

BanglaBook.org

'ওর সুইচ অফ করে দিল কে?' নানাভাই বিড়বিড় করে বললেন।

আমি ব্যাপারস্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শর্মিলা আমাকে বলেছেন, পিনাকী দত্তগুপ্তের ব্যাপারটা নানা জানেন। হয়তো নানাই ওঁর কাম তামাম করে দিয়েছেন। অথচ দত্তগুপ্ত মার্ডার হলে নানার আয় মাসে-মাসে দশহাজার টাকা করে কমে যাবে। সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নানাভাইয়ের কাছে শর্মিলার নাম বলাটা কি ঠিক হবে? নাকি...।

'ঠিক আছে, মিত্তিরবাবু। এই মার্ডারের ব্যাপারটা আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখছি। তবে আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি ভদ্দরলোক—তার ওপর আবার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আমি কড়েয়া থানায় মেসেজ পাঠিয়ে দেব—আপনাকে কেউ ট্রাবল দেবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...।'

আমি নানার কথার প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিলাম যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই—নিতান্তই একজন ছাপোষা প্রোগ্রামার। কিন্তু নানাভাই একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন।

'...আমি আরও দুটো কম্পুটার কিনছি। এই তিনটে মেশিন এসি রুমে বসিয়ে দেব। আপনি এখন কত করে স্যালারি পান?'

আমি বিরাট একটা ধাক্কা খেলাম। নানাভাই কোনদিকে এগোতে চাইছেন? কিন্তু পরিস্থিতি সুবিধের নয়। তাই মিনমিন করে জবাব দিলাম, 'সাড়ে দশহাজার মতো।'

'ব্যস!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন নানাভাই ঃ 'এতে কোনও ভদ্দরলোকের মাস চলে! আপনি আমার কম্পুটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যান। মান্থলি বিশহাজার পাবেন—উইথ পার্ক্স। কিঁউ?'

অপমানে আমার মুখে কোনও কথা জোগাচ্ছিল না। ঠোঁটজোড়া যে থরথর করে কাঁপছে সেটা ভালো করেই টের পেলাম। কেন যে মরতে আমি এখানে এলাম! শরীরটা শক্ত করে আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। বর্ষার কথা ভেবে নিজেকে শান্ত করতে চাইলাম।

নানাভাই মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। আড়চোখে সে হাসি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আর ভেতরে-ভেতরে জ্বলছিলাম।

হিকপিক কম্পিউটারের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল আমার কাছে। মা যেমন করে অভিমানী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সেভাবে আমার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'নানাভাইয়ের আপনাকে পছন্দ হয়েছে। তাই এরকম দারুণ অফার দিয়েছেন। রাজি হো যা, লালটু, রাজি হো যা—।'

BanglaBook.org

আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। দু-গাল থেকে আগুনের হলকা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। হে ভগবান! যদি তুমি সত্যিই থেকে থাকো, তা হলে আমাকে অপমান সহ্য করার শক্তি দাও। আর যদি না থেকে থাকো, তা হলে তো মিটেই গেল!

'কা মিত্তিরবাবু, কুছ বোলিয়ে...।' নানাভাইয়ের গলা পেলাম।

আরও কিছুক্ষণ সময় নেওয়ার পর মুখ তুললাম। আমার মুখ দেখে নানাভাইয়ের মুখটা একটু বদলে গেল। হিকপিক একটু সরে দাঁড়াল আমার কাছ থেকে।

দাঁতে দাত চেপে আমি বললাম, 'আমার নতুন চাকরির দরকার নেই, নানাভাই। পুরনোটাতেই বেশ চলে যাচ্ছে।'

'আপনার তো গুস্‌সা হয়ে গেল দেখছি।'

আমি হিকপিকের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'আপনি যদি রাগ না করেন তা হলে কয়েকটা কথা বলি, নানাভাই...।'

'হাঁ, হাঁ—বলুন, বলুন।' হাত নেড়ে আমাকে উৎসাহ দিলেন নানা।

'এই যে আপনার শাগরেদ হিকপিক—' ইশারায় হিকপিককে দেখালাম আমি ঃ 'ওর যা চেহারা তাতে ঝোড়ো বাতাসে রাস্তায় বেরোতে পারবে না—হাওয়ায় উড়ে যাবে। ওর বডি এত সরু যে, মেঝেতে কোনও ছায়া পড়বে না। ওর নাম হিকপিকের বদলে লিকপিক হলে মানানসই হত। তা সত্ত্বেও ওর কী সাহস দেখুন—।' হাসলাম আমি ঃ 'তার কারণ ওর পেছনে আপনি আছেন—আমার পেছনে কেউ নেই। ওর পকেটে হয়তো আর্মস আছে—আমার নেই। খোদা মেহেরবান তো চুঁহা পহেলবান।'

আমার কথায় হো-হো করে হেসে উঠলেন নানাভাই। গ্লাসের ওষুধটুকু এক ঝটকায় গলায় ঢেলে দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে মজা পাওয়া গলায় বললেন, 'মিত্তিরবাবু মরদ আছেন দেখছি। তো আমি যদি ওই শালা হিকপিকের পেছনে না থাকি, ওর পকেটে যদি কোনও আর্মস না থাকে, তা হলে আপনি কী করবেন?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম ঃ 'দেখিয়ে দেব যে, আমি লালটু নই। ওরকম তিন-চারটে হিকপিককে পালিশ করার হিম্মত রাখি।'

হিকপিক আমার দিকে তেড়ে আসতে যাচ্ছিল, আমি হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করলাম, বললাম, 'এখনও থামো, নইলে দেরি হয়ে যাবে।' তারপর নানাভাইয়ের দিকে ফিরে ঃ 'আজ চলি, নানাভাই। আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

আমি নানার তিনজন শাগরেদের ম্যাপই মাথায় টুকে নিয়েছিলাম। এই মুখগুলো কখন কোথায় কাজে লাগে কে জানে!

নানার টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

হিকপিক আমার পাশে-পাশে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। চাপা গলায় হিসহিস করে বলে উঠল, 'তেরা হিসাব ম্যাঁয় ফিট কর দুঙ্গা।'

আমার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে গেল। রাগে পাগল হয়ে আমি এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালাম। খপ করে হিকপিকের চোয়াল চেপে ধরলাম ঃ 'অব্‌ভি ওয়ক্ত হ্যায়, লালটু, সুধর যা।'

কথাটা বলেই ওকে পেছনদিকে আলতো করে ঠেলে দিলাম। হিকপিক চার্লি চ্যাপলিনের মতো টাল খেতে-খেতে পেছিয়ে গেল।

নানা কিংবা তাঁর অন্য শাগরেদরা একটি কথাও বলল না, জায়গা থেকেও নড়ল না। বরং মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

বাইরে এসে রশিদকে পেলাম। ওকে ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে শুরু করলাম।

॥ সাত ॥

রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে চেষ্টা করছিলাম।

নানাভাইয়ের টেবিলে আমি সিগারেটের প্যাকেট দেখেছি, চুরুট নয়। কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা? পুলিশ মার্ডার ওয়েপনটা পেয়েছে কি না আমি জানি না—জানার কোনও উপায়ও নেই। যদি পেয়ে থাকে, তা হলে সেটা কি দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেল, না কি অন্য কোথাও থেকে!

আমি শুরু থেকে অঙ্কটা ভাবছিলাম।

দত্তগুপ্ত হয়তো খারাপ কাজ করত, কিন্তু তাই বলে কি খুনি পার পেয়ে যাবে! তা ছাড়া আসল খুনির হদিস না পেলে হয়তো আমাকেই তার বদলে জেলে গিয়ে প্রক্সি দিতে হবে। বাপি আমাকে বেশিদিন কাছে পাননি, কিন্তু তারই মধ্যে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন। আমি যে এখন কী করি!

পিনাকী দত্তগুপ্ত, শর্মিলা বোস, ঘটনার দিন রাতে সিঁড়ি-বেয়ে-ওঠা মোটা মতন সেই অবাঙালি ভদ্রলোক, নানাভাই, বর্ষা এবং আমি। এই খুনের ব্যাপারে কারও গুরুত্বই কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমি কি মিথ্যে-মিথ্যে ভয় পাচ্ছি? এমন কি হতে পারে যে, সম্পূর্ণ অচেনা কেউ সম্পূর্ণ অজানা কোনও কারণে পিনাকী দত্তগুপ্তকে খুন করেছে! হতেও তো পারে।

BanglaBook.org

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দীর্ঘশ্বাসকে বললাম, তোরা যত খুশি বুক ঠেলে লাইন দিয়ে পরপর বেরিয়ে আয়, কিন্তু আমার প্রবলেমটা সল্‌ভ করে দে।

বিছানায় উঠে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

সেই মুহূর্তেই মনে হল, কোথায় যেন একটা গরমিলের খোঁজ পেয়েছি আমি। কার একটা কথায় যেন আমার খটকা লেগেছিল। কে যেন বলল কথাটা! কে যেন...।

বহু চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। কিন্তু আমার মন বলছিল, ওই কথাটা মনে পড়লেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব আমি।

রাতে বাড়ি ফিরতেই মিলি বলেছে আমার অফিস থেকে বর্ষা দাশগুপ্ত নামে একজন ফোন করেছিলেন। আমার মোবাইলে নাকি বহুবার চেষ্টা করেও লাইন পাননি।

অনেকসময় দেখেছি আকাশ মেঘলা থাকলে অথবা বৃষ্টি হলে মোবাইল ফোনের স্যাটেলাইট ঠিকমতো কাজ করে না। ফোনের ডিসপ্লেতে টাওয়ারের সিগনালটা কমজোরি হয়ে নেমে যায়। কাল হয়তো সেইজন্যেই বর্ষা লাইন পায়নি।

আজকের রাতটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে চিন্তা করতে হবে। অজস্র ভাঙা কাচ ছড়ানো পথে খুব সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে হবে। তারপর গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে।

তাই বর্ষাকে আর ফোন করিনি। অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে শুধু ভেবে চলেছি। অথচ তারই মধ্যে বর্ষার কথা মনে পড়ছিল।

এইভাবেই নানান কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন ঘুম ভাঙল মায়ের ডাকাডাকিতে।

উঠেই দেখি ঘড়ির কাঁটা নয়ের ঘর পেরিয়ে গেছে।

মা বলল, 'কী রে, আজ অফিসে বেরোবি না?'

'না, শরীরটা ভালো নেই।'

'শরীরের আর দোষ কী! দিন-রাত্তির টো-টো করলে কখনও শরীর ভালো থাকে!'

কাল বৃষ্টিতে ভিজে আমার একটু ঠাণ্ডা মতন লেগে গিয়েছে। একটা নাক রাত থেকে বন্ধ হয়ে আছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে।

মায়ের কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বিছানা ছেড়ে নামলাম। কলতলায় গিয়ে চোখেমুখে জল দিতে চোখ জ্বলতে লাগল।

BanglaBook.org

ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে আসতেই মিলি খবরের কাগজ আর চা দিয়ে গেল। খবরের কাগজে দত্তগুপ্তকে নিয়ে এ ক'দিন আর কোনও খবর ছাপা হয়নি—আজও কোনও খবর নেই।

চায়ের পর সিগারেট ধরিয়ে আরও আধঘণ্টা সময় কাটালাম। বিছানার ওপরে খবরের কাগজটা খোলা ছিল। সেখানে একটা বড় মাপের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ছিল। সিগারেটের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে ওরা দাবি করছে যে, ওদের সিগারেটের তামাকটা খুব হালকাও নয়, খুব কড়াও নয়—'ঠিক যেমনটি আপনি চান'।

কাল থেকে মনে-না-পড়া কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বর্ষাকে অফিসে ফোন করলাম।

ফোন ধরেই ও একলক্ষ প্রশ্ন ছুড়ে দিল আমার দিকে।

ওর প্রশ্নের জোয়ারে ডুবে যেতে-যেতে আমি বললাম, 'শরীরটা ভালো নেই। আমি আজ অফিসে যাব না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। টেলিফোনে নয়—সামনাসামনি কথা হওয়া দরকার। আজ সন্ধেবেলা ফ্রি আছ?'

'অফ কোর্স! সব কিছু জানার জন্যে ছটফট করছি।'

'সাড়ে ছ'টার সময়ে "জগৎ" সিনেমা হলের সামনে আসতে পারবে? আমি পাঁচ মিনিট আগে থেকেই তোমার জন্যে ওখানে ওয়েট করব। দেখা হলে সব বলব...।'

'ও. কে., রীতেনদা।'

'সি য়ু অ্যাট সিক্স থার্টি...।'

ফোন শেষ করে ভাবতে বসলাম, বর্ষাকে কীভাবে সব বলব। সবকিছু কি ওকে বিশ্বাস করে বলা যায়? ওরও তো দত্তগুপ্তের সঙ্গে কোনও সমস্যা তৈরি হয়ে থাকতে পারে—শর্মিলার মতন! তা হলে কতটুকু ওকে নিরাপদে বলা যায়?

এইসব উথালপাথাল ভাবনায় দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে শর্মিলার ফোন এল।

কৌতূহল বড় বিচিত্র জিনিস—বিশেষ করে মেয়েদের।

'মিস্টার মিত্র, শর্মিলা বোস বলছি।'

'হ্যাঁ—বলুন।'

'কাল নানাভাইয়ের ওখানে কী হল?'

'রশিদ আপনাকে বলেনি?'

BanglaBook.org

কয়েক সেকেন্ড ও-প্রান্ত চুপচাপ। তারপর ঘনিষ্ঠ অভিমানী গলায় ঃ 'বলতে না চান বলবেন না—এরকমভাবে ইনসাল্ট করার কী আছে!'

শর্মিলা কি আমাকে নিয়ে অন্যরকম কিছু ভাবতে শুরু করেছেন! জনির সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে মাত্র মাসছয়েক। এর মধ্যেই শেকল আলগা হয়ে পড়তে চাইছে! নাকি এটা ওঁর স্বভাব?

'পরের দিকে শুধু লাস্ট লেভেলের কাজই করতাম। প্রথম-প্রথম অভাবের জন্যে...শেষ দিকে হয়তো স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল...কে জানে!' শর্মিলার কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমার।

আমি বললাম, 'না, না, সেরকম কিছু নয়। ফোনে তো এত কথা বলা যায় না! সামনাসামনি দেখা হলে বলব।'

'এখনই আমার এখানে চলে আসুন না। বাড়িতে কেউ নেই—একা-একা ভীষণ বোর হচ্ছি। আপনার কথা শুনতে-শুনতে সময় কেটে যাবে...।'

শর্মিলার স্বভাব দেখছি পিনাকী দত্তগুপ্তকে অমর করে রাখবে!

'না, ম্যাডাম—এখন একটা কাজে ফেঁসে গেছি। পরে সময়মতো গিয়ে আপনাকে বলে আসব—।'

'ঠিক আছে—আমার বাড়িতে আসতে হবে না। আমরা অন্য কোথাও মিট করতে পারি...।'

'এক্ষুনি তো সেটা করা যাবে না। পরে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলে ঠিক করে নেব। ও হ্যাঁ, রশিদ আপনার কথামতো হেল্প করেছে। আর সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখুন, নানাভাইয়ের ওখানে গিয়ে খুব একটা কাজ হয়নি।'

'তার মানে!'

'তার মানে হল, এখনও আমি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে আছি।'

ফোন অফ করে দিলাম।

গতকালের মেঘলাভাবটা আকাশে থেকেই গিয়েছিল। বিকেল পাঁচটা থেকে বৃষ্টি শুরু হল।

প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি আর বর্ষা শর্মিলা বোসের দরজায় কড়া নাড়লাম। বৃষ্টি তখনও থামেনি।

বর্ষার সঙ্গে সময়মতোই আমি দেখা করেছি। আমার সর্দির ভাবটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে কাশি। তাই ছাতা নিয়েই বেরিয়েছি।

BanglaBook.org

ও সময়মতো হাজির হতেই ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ছাতা থাকলেও ওর চুড়িদার বেশ খানিকটা ভিজে গেছে। পোশাকের পায়ের কাছে কাদার ছিটে। তবে মুখটা টলটল করছে।

ওকে দেখামাত্রই বুকের ভেতরে উলটোপালটা ব্যাপার শুরু হল।

রাজাবাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা কথা বলছিলাম। প্রথমে খানিকটা অফিসের কথা হল। তারপর দত্তগুপ্ত, নানাভাই—এসব শুরু হল।

পথ চলতে-চলতে কথা বলা খুবই শক্ত ব্যাপার। তার ওপর রাস্তায় জল-কাদা, যানজট, আর মানুষের ভিড়। সায়েন্স কলেজ পেরিয়ে একটা ছোট রেস্তরাঁয় আমরা বসলাম।

আমার কাছ থেকে নানাভাইয়ের ব্যাপারটা সংক্ষেপে শোনার পর বর্ষা বেশ হতাশ হল। খানিকটা ভয়ও পেয়ে গেল ও। পুলিশ যদি আবার হ্যারাস করে! ওকে বললাম যে, নানা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন যে, পুলিশ আমাকে আর বিরক্ত করবে না। তবে ওর কথা নানাকে বলিনি। যদি নিতান্ত দরকার হয়, তা হলে বলতে হবে।

বর্ষা বলল, 'না, না—বলার দরকার নেই।' ওর মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ওকে বললাম, 'বর্ষা, তোমাকে এখন একজনের বাড়িতে নিয়ে যাব—যাবে?'

চমকে উঠল বর্ষা ঃ 'কার বাড়িতে!'

'শর্মিলা বোসের বাড়িতে। কাছেই গড়পাড়ে উনি থাকেন।'

'হঠাৎ ওঁর বাড়িতে কেন?'

'একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা লেগেছে। সেই ব্যাপারে একটু কথা বলতে যাব। তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হয়। তা ছাড়া তুমি তো ওঁকে কখনও দ্যাখোনি। ওঁর সঙ্গে আলাপও হয়ে যাবে।'

'আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে—।'

'তোমার কোনও ভয় নেই—আমি তো সঙ্গে আছি!'

মাঝারি বৃষ্টির মধ্যেই আমরা রেস্তরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই প্যান্টের পকেটে আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

বোতাম টিপে কথা বললাম।

আমার এল. আই. সি.-র এজেন্ট। উনি জানতে চাইছেন, গতবছরে আমি যে বলেছিলাম এ-বছর একটা 'জীবন সুরক্ষা' পলিসি করাব, সেটা করাব কি না।

BanglaBook.org

চমৎকার প্রশ্ন, এবং চমৎকার সময়ে! 'জীবন সুরক্ষা' যদি আমার দরকার না হয়, তা হলে আর কার দরকার হবে!

ওঁকে বললাম, নিশ্চয়ই করাব। উনি যেন নেক্সট উইকে আমার অফিসে আসেন।

মিনিটদশেকের মধ্যেই আমরা শর্মিলা বোসের দরজায় পৌঁছে গেলাম।

দরজা খুলে আমাকে দেখেই তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন ঃ 'এ কী! আপনি!' তারপর চাপা গলায় বললেন, 'জনি বাড়িতে আছে।'

আমি হাসলাম। তারপর একটু পাশে সরে দাঁড়াতেই শর্মিলা আমার পেছনে দাঁড়ানো বর্ষাকে দেখতে পেলেন। দরজার কাছটায় আলো তেমন জোরালো নয়। কিন্তু ওদের দুজনের মুখ আমি স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

না, ওরা একে অপরকে আগে কখনও দেখেনি।

আমি ভেজা ছাতাটা দরজার পাশে রাখলাম। তারপর শর্মিলাকে একরকম পাশ কাটিয়েই ভেতরে ঢুকে গেলাম।

বর্ষাও দরজার পাশে ছাতা রেখে বাধ্য মেয়ের মতো আমাকে অনুসরণ করল।

সামনের ঘরের দরজা খোলা ছিল। একটা মোড়া আর একটা এলোমেলোভাবে ভাঁজ করা খবরের কাগজ চোখে পড়ছিল।

ঘরে ঢোকার আগে আমি শর্মিলা আর বর্ষাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বললাম, 'ম্যাডাম, আপনার ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই। বর্ষা আমার অফিস কোলিগ। তা ছাড়া দত্তগুপ্তের কাছে ও পার্ট টাইম কাজ করত...ফার্স্ট লেভেলের। দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাট থেকে পুলিশ ওর ফোন নাম্বার পেয়েছে।' হেসে বললাম, 'আমাদের তিনজনের একই প্রবলেম। সেই প্রবলেম সল্‌ভ করার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

দেখে মনে হল, শর্মিলা খানিকটা যেন ধাতস্থ হলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'জনি পাশের ঘরে টিভি দেখছে—।'

জনির ইংরেজি গানের কলি আমার কানে আসছিল। বোধহয় 'এম টি ভি এনজয়' চালিয়ে টিভির গানটাই মুখস্থ করছে।

ঘরটাকে চট করে একটু গুছিয়ে নিয়ে শর্মিলা আমাদের বসতে বললেন। সামান্য দূরে নিজেও বসলেন। ওঁর পরনে ম্যাক্সি। চুলের গোছা কপালে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে। হালকা পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে।

'কাল নানাভাইয়ের ওখানে কী হল, মিস্টার মিত্র?'

BanglaBook.org

আমি হাত তুলে ওঁকে ইশারা করলাম ঃ 'পরে বলছি। আগে আপনি বলুন, দত্তগুপ্ত কি চুরুট খেতেন?'

শর্মিলার ভুরু কুঁচকে গেল।

কাছেই কোথাও টিনের চালের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে রিমঝিম শব্দ হচ্ছিল। বৃষ্টির কেমন একটা গন্ধও নাকে আসছিল।

'মাঝে-মাঝে মিস্টার দত্তগুপ্তকে যেন চুরুট খেতে দেখেছি।' থেমে-থেমে বললেন শর্মিলা।

আগেও এই কথাই আমাকে তিনি বলেছিলেন।

বর্ষা সঙ্গে-সঙ্গে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলাম। বর্ষা কী বলেছে আমার স্পষ্ট মনে আছে। দত্তগুপ্ত ক্লাসিক সিগারেট খেতেন।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'ম্যাডাম, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলছেন কেন? দত্তগুপ্ত চুরুট খেতেন না—ক্লাসিক সিগারেট খেতেন। দত্তগুপ্ত যখন মার্ডার হন তখন আমি ওঁর ফ্ল্যাটে চুরুটের গন্ধ পেয়েছিলাম। নানাভাইও চুরুট খান না। ...তা হলে কে চুরুট খায়? নিশ্চয়ই আপনি নন?'

আমার ঠাট্টায় শর্মিলা হাসবেন কি না ভাবছিলেন। ঠিক তখনই একটা গর্জন শোনা গেল।

'আমি চুরুট খাই। সো হোয়াট—সো ব্লাডি হোয়াট?'

টের পাইনি কখন দরজায় জনি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে সরু ধরনের একটা জ্বলন্ত চুরুট। পরনে গাঢ় ছাইরঙের বারমুডা আর সাদা পোলো নেক টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকের ওপরে লেখা ঃ 'দিস সিটি রান্‌স অন লাভ'।

জনি চোখ ছোট করে আমাকে দেখছিল। দৃষ্টিটা এমন যেন যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও কিছু করে বসতে পারে।

শর্মিলা ভয়ের চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বর্ষার মুখেও কখন যেন আশঙ্কার ছাপ পড়েছে।

আমি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। চুরুটের গন্ধটা শুঁকে দেখার জন্যে জনির দিকে এক পা এগোলাম।

ঠিক তখনই দেওয়ালে টাঙানো ফটোতে আমি হিকপিককে দেখতে পেলাম। জনির পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। এইজন্যেই হিকপিককে আমার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল!

BanglaBook.org

জনির চুরুটের গন্ধ নাকে আসতেই সব অঙ্ক মিলে গেল।

'সো ইট ওয়াজ য়ু।' জনির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'মার্ডার ওয়েপনটা তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

উত্তরে জনি নোংরা খিস্তি করে উঠল। চুরুটটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার তলপেটে লাথি চালাল।

বর্ষা ভয়ের চিৎকার করে উঠল। শর্মিলা 'জনি!' বলে ডেকে উঠলেন।

আমি পলকে শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়েছি বটে, তবে লাথিটা পুরোপুরি এড়াতে পারলাম না। ওটা আমার কোমরে এসে লাগল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম।

সামলে নিয়ে উঠে বসার আগেই জনি এগিয়ে এল আমার কাছে, কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বের করে বলল, 'নোবডি মেসেস অ্যারাউন্ড উইথ মাই ওয়াইফ। দত্তগুপ্ত আমার ওয়াইফকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। ওর হিসেব আমি চুকিয়ে দিয়েছি। এখন তুই আমার ওয়াইফকে লাফড়ায় জড়াতে চাইছিস!'

জনি আমাকে দেওয়ালে ঠেসে ধরল। ওর ডানহাত আড়াআড়িভাবে চেপে বসল আমার গলায়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, চোখের নজর ঝাপসা হয়ে এল। সেই ঝাপসা নজরেই আমি জনি আর হিকপিকের রঙিন ফটোটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমার ভেতরে একটা পাগল-করা রাগ টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। কিন্তু জনি হিকপিক নয়। ওঁকে সামলাতে আমার মতো অন্তত দুজন লোক দরকার। এখন আর-একজন পাব কোথায়!

বর্ষা আর শর্মিলা জনির হাত ধরে টি-শার্ট ধরে যেমন-তেমনভাবে টানাটানি করছিল। ওকে ছাড়াতে চেষ্টা করছিল। আর একইসঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল।

জনির কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ও আমার মুখের কাছে মুখ এনে তোড়ে গালাগাল দিচ্ছিল। ওর থুতুর কণা বৃষ্টির মতো আমার মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ঠিক তখনই আমার খড়কুটো-আঁকড়ে-ধরতে-চাওয়া হাত মোবাইল ফোনটা খুঁজে পেল।

এক মুহূর্তও দেরি না করে আমি মোবাইল ফোনটা হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিলাম জনির বাঁ কানের ওপরে।

BanglaBook.org

গরম তেলে গোটা লঙ্কা ফেললে যেমন ফেটে যায় সেরকম একটা শব্দ হল। ফোনের খাটো অ্যানটেনাটা জনির কানের গর্তে ঢুকে গেল কি না কে জানে! তবে জনি হুড়মুড় করে খসে পড়ে গেল মেঝেতে। নিথড় হয়ে পড়ে রইল। ওর বাঁ কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল।

আমি মোবাইল ফোনটা আবার উঁচিয়ে ধরেছি দেখে শর্মিলা বুকফাটা চিৎকার করে ছুটে এসে আমাকে একেবারে জাপটে ধরলেন। হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে মোবাইল ফোনটা আমার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি শর্মিলাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে মেঝেতে বসে পড়লাম। ঘোলাটে চোখে বর্ষার দিকে তাকিয়ে হাঁফাতে লাগলাম। বর্ষা তখন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এর মধ্যেই আশপাশের দু-চারজন বাসিন্দা ঘরের দরজায় এসে ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। আমি ইশারায় ওদের চলে যেতে বললাম। তাতে ওরা ইতস্তত করছে দেখে ধমকের গলায় বললাম, 'এসব ফ্যামিলি ম্যাটার। আপনারা চলে যান, প্লিজ।'

এবার কাজ হল।

আমি গলায় হাত বোলাতে-বোলাতে উঠে দাঁড়ালাম। বর্ষা ছুটে এসে আমাকে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম। অনেক ভুলে যাওয়া কবিতার লাইন পলকে মনে পড়ে গেল।

শর্মিলা তখন জনির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওর মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিলেন।

আমি বর্ষাকে বললাম, 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও—।'

ও দরজা ভেজিয়ে দিতেই শর্মিলাকে বললাম, 'ম্যাডাম, জনিকে এখন একটু ঘুমোতে দিন। সেই ফাঁকে আপনাকে দুটো কথা বলে নিই...।'

শর্মিলা আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। আমার ডান হাতে ধরা অ্যানটেনা ভাঙা মোবাইল ফোনটার দিকে চোখ পড়তেই ওঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জনির কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেলেন।

'জনি আগে নানাভাইয়ের দলে ছিল?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। ও-ই মিস্টার দত্তগুপ্তের কাছে মাসে-মাসে টাকা আনতে যেত। সেই থেকেই আমার সঙ্গে পরিচয়...তারপর ফ্রেন্ডশিপ...।'

'জনির রিভলবারটা এখন কোথায়?'

'ওটা জনির নয়—' কাঁদতে-কাঁদতে শর্মিলা বললেন, 'মিস্টার দত্তগুপ্তকে শায়েস্তা করার জন্যে রিভলবারটা ও হিকপিকের কাছ থেকে জোগাড়

BanglaBook.org

করেছিল। সেদিন ও আমার সঙ্গে পিনাকী দত্তগুপ্তের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল নেহাতই ওঁকে ভয় দেখাতে। শুরুতে কথাবার্তা বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই মিস্টার দত্তগুপ্ত আমার নামে একটা নোংরা কথা বলায় জনি রাগে ফেটে পড়ে। ওঁকে লেফট অ্যান্ড রাইট মারধর করে বিছানায় কাত করে দেয়। তারপর আমি কিছু করে ওঠার আগেই আচমকা ওর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে গুলি করে দেয়।

'ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকি। ওকে একরকম ধাক্কা দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিই। তারপর তাড়াহুড়ো করে দত্তগুপ্তের ঘর সার্চ করে আমার ফটোর খামটা খুঁজে বের করি। দত্তগুপ্তের লাইটার নিয়ে বাথরুমে চলে যাই—সেখানে খামটা পুড়িয়ে কমোডে ফেলে দিয়ে ফ্লাশ করে দিই। লাইটারটা শাড়ির আঁচলে মুছে দত্তগুপ্তের ঘরে সবে রেখেছি, তক্ষুনি ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি আপনি...' কান্নার দমকে শর্মিলার গলা কেঁপে গেল, 'আপনাকে আমি চিনি না, ফ্ল্যাটে কেন এসেছেন তাও জানি না। কী বলব ভাবছি—তখন আপনিই নিজে থেকে সব ইনফরমেশান জানিয়ে আমাকে হেল্প করলেন।

'পিনাকী দত্তগুপ্ত খুব নোংরা লোক ছিল। বহু মেয়ের লাইফ ও শেষ করে দিয়েছে। অতগুলো লাইফের পাশে ওর একটা লাইফের কী দাম আছে, বলুন! জনি আমার জন্যে নানাভাইয়ের দল ছেড়ে দিয়েছিল। দল ছাড়তে চাইলে নানাভাই কাউকে আটকান না। শুধু কন্ডিশান হচ্ছে, সে যেন নানাভাইয়ের ডার্ক অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। তা হলে নানাভাই বা তাঁর গ্যাঙের কেউ তার নামও কোনওদিন উচ্চারণ করবে না। কিন্তু কন্ডিশান ব্রেক করলেই সেই লোকটির গল্প শেষ।' শর্মিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন ঃ 'এবার তা হলে জনির গল্প শেষ...আমার গল্পও শেষ। বিশ্বাস করুন রীতেনবাবু, জনিকে আমি ভালোবাসি—ও-ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে—।'

আমার মুখে বোধহয় একটু অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে আমার পায়ের কাছে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন শর্মিলা। হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে জড়ানো গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে যে ইনটিমেট কথাবার্তা বলেছি সেটা স্রেফ নিজেরা বাঁচার জন্যে। আমাদের এই নতুন সংসারকে বাঁচাতে আমি আরও পাঁচ-সাতজনের সঙ্গে শুতে রাজি আছি। কিন্তু আমি জনিকে ছেড়ে থাকতে পারব না...বিশ্বাস করুন...।'

BanglaBook.org

শর্মিলার পরের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গিয়ে আর বোঝা গেল না।

আমি একটু ইতস্তত করে ওঁকে ধরে তুললাম। অবাক চোখে দেখলাম ওঁর মুখের দিকে। ভালোবাসা, তোমার মধ্যে এমন কী আছে যে, বারবার তুমি জিতে যাও!

বর্ষার মুখের দিকে তাকালাম আমি। তারপর শর্মিলাকে বললাম, 'ম্যাডাম, পুলিশকে আমরা কিছু জানাব না—আপনাকে কথা দিলাম। পুলিশ যদি আমাকে হাজার প্রশ্ন করে তা হলেও ওদের আমি আপনার কথা বলব না। বলব না যে, আপনাকে আমি খুঁজে পেয়েছি।'

শর্মিলা কাঁদতে-কাঁদতে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন।

জনি ততক্ষণে সামান্য নড়তে শুরু করেছে।

আমি জনির দিকে ইশারা করে বললাম, 'ওকে একটু অ্যাটেন্ড করুন। পরে সব বুঝিয়ে বলবেন। আমরা এখন যাই...।'

শর্মিলা কৃতজ্ঞ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি আর বর্ষা ওঁর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

বর্ষাকে বাড়ি পৌঁছে দেব বলে একটা ট্রামে উঠলাম। একেবারে ফাঁকা ট্রাম। সামনের দিকের জোড়া সিটে পাশাপাশি বসলাম দুজনে।

বর্ষা আলতো সুরে জিগ্যেস করল, 'গলায় এখনও ব্যথা আছে?'

আমি বললাম, 'না—।' যদিও গলাটা বেশ ব্যথা করছিল।

বর্ষা আড়ালে আমার হাত চেপে ধরল।

ট্রাম এন্টালি পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা একটিও কথা বলিনি। শুধু বর্ষার হাতটা আমার হাতের মধ্যে ধরা ছিল।

ওকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে আসার সময় জিগ্যেস করলাম, 'বর্ষা, আমি কি এখনও স্রেফ একজন অফার নমিনি?'

বর্ষা উত্তরে শুধু হাসল। কিন্তু হাসিটা এমন যে আমার ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করল।

BanglaBook.org

সর্বনাশের কাছাকাছি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ধর্ষণ করে খুন

***স্টাফ রিপোর্টার ঃ** শনিবার রাতে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের চিংড়িঘাটা এলাকায় ঝরনা সামন্ত (২২) নামে এক তরুণীকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। রবিবার ভোরে তরুণীটির মৃতদেহ খালপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহে ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।*

রবিবারের ভোরবেলাটার গায়ে কেমন যেন ছুটির মেজাজ মাখানো ছিল। সমতল পিচের রাস্তায় মসৃণ বেগে রোলার স্কেট্‌স চালিয়ে যেতে-যেতে দ্বৈপায়নের ঠিক সেরকমটাই মনে হচ্ছিল।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। পাখিরা গাছের ঠিকানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘুম জড়ানো চোখে ডানা মেলে দিয়েছে খাবারের সন্ধানে। ওদের মিষ্টি ডাকের টুকরো দ্বৈপায়নের দারুণ লাগছিল। দু-পাশের বড়-বড় গাছের পাতায় এখনও কুয়াশা জড়ানো। শৌখিন সব বাড়ির লাগোয়া বাগান থেকে গোলাপ-গাঁদার হালকা গন্ধ দ্বৈপায়ন ঘ্রাণে টের পাচ্ছিল।

সল্ট লেক এলাকাটা এমনিতেই নির্জন। তার ওপর রবিবারের এই সাতসকালে এলাকাটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছিল। নিস্তব্ধ পরিবেশে দ্বৈপায়নের রোলার স্কেট্‌স-এর চাকার ঘর্ঘর শব্দ কানে বাজছিল। আর 'রিবক'-এর ট্র্যাক সুট ভেদ করে ঠাণ্ডা যেন ঢুকে পড়ছিল বুকের ভেতরে।

একটু দূরেই কাঠগোলাপ গাছটাকে দেখতে পেল দ্বৈপায়ন। গাছে বড়-বড় সাদা ফুল ফুটে আছে। কিছু ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

গাছের নীচে রিকশা-স্ট্যান্ড। সেখানে মাত্র একটি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে। রিকশাওয়ালা চাদর মুড়ি নিয়ে প্রায় কবন্ধ সেজে ঠাণ্ডার সঙ্গে লড়াই করছে।

একটা লাল রঙের হুন্ডাই গাড়ি 'হুস' করে দ্বৈপায়নকে পেরিয়ে চলে গেল। ঠিক তখনই দূর থেকে কেউ ডেকে উঠল ঃ 'দিপু, এবার ফিরে এসো।'

রোলার স্কেট্‌স-এ চলতে-চলতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল দ্বৈপায়ন। অনেকটা দূরে হলদে রঙের ট্র্যাক সুট পরে অচ্যুত দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্বৈপায়নকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

দ্বৈপায়ন ওকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল। তারপর ওর চলার গতি বাড়িয়ে দিল। সুইমিং পুল স্টপেজের কাছটায় 'ইউ' বাঁক নিয়ে ও অচ্যুতকে

BanglaBook.org

লক্ষ করে ফিরে চলল। অচ্যুতের ডাকনাম মিমো, তবে দ্বৈপায়ন ওকে আদর করে গুটে বলে ডাকে। বছর ন'-দশের সরল সাদাসিধে ছেলে। নারায়ণ দাস বাঙ্গুর স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে। দ্বৈপায়নদের ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাটেই ওরা থাকে।

গুটে ডাকাবুকো স্বাস্থ্যবান ছেলে। পড়ায় যত না মন তার চেয়ে ঢের বেশি মনোযোগ খেলাধুলো আর টিভি সিরিয়ালে। যেমন, যেখানে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন 'শক্তিমান' সিরিয়ালটা ওর দেখা চাই-ই চাই। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে ওর নিত্য চেঁচামেচি লেগে আছে।

রোজ ভোরবেলায় দ্বৈপায়ন পায়ে রোলার স্কেট্‌স লাগিয়ে প্র্যাকটিস করতে বেরোয়। মাসখানেক আগে হঠাৎ একদিন গুটে বায়না ধরে বসল ওকেও রোলার স্কেট করা শিখিয়ে দিতে হবে। তারপর থেকে দ্বৈপায়ন রবিবার আর ছুটির দিনে ভোরবেলা ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। না নিয়ে গেলেই বাচ্চা ছেলেটা কান্নাকাটি করে দ্বৈপায়নকে আঁচড়ে-কামড়ে একেবারে অস্থির করে তোলে।

গুটের কাছে পৌঁছে থামল দ্বৈপায়ন। রাস্তার পাশে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। তারপর ফিতে খুলে পা থেকে রোলার স্কেট্‌স দুটোকে আলাদা করে ফেলল। গুটেকে কাছে ডাকল, 'আয়, এদিকে আয়—।'

গুটে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিল। দ্বৈপায়ন কাছে ডাকতেই ও মায়ের শেখানো মতো রাস্তার ডান দিক আর বাঁ দিকে একবার করে তাকাল—তারপর এক ছুটে দ্বৈপায়নের কাছে চলে এল। অধীর আগ্রহ নিয়ে ওর রোলার স্কেট্‌স-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

ট্র্যাক সুটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা চাবি বের করল দ্বৈপায়ন। একটা রোলার স্কেটের চেসিসের দুটো নাট খুলে চেসিসের দুটো টুকরোকে মুখোমুখি ঠেলে ছোট করে গুটের পায়ের মাপে নিয়ে এল। নাট দুটো আবার টাইট করে দিল চাবি দিয়ে। চারটে চাকার নাট ঠিকমতো টাইট আছে কিনা একবার পরখ করে নিল। তারপর গুটের কেড্‌স জুতো পরা ডানপায়ে রোলার স্কেটটা ফিতে দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিল। অন্য স্কেটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এরপর প্র্যাকটিসের পালা।

গুটের হাত ধরে দ্বৈপায়ন ওর পাশে-পাশে হেঁটে চলল। আর গুটে ডান পায়ে ভর দিয়ে চাকা গড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে লাগল।

'দিপুদা, আমার শিখতে ক'দিন লাগবে?'

দ্বৈপায়ন সামান্য চিন্তা করার ভান করে তারপর বলল, 'এই ধর মাসদুয়েক।'

BanglaBook.org

'তারপর বাপিকে বলব রোলার এস্কেট কিনে দিতে।'

'এস্কেট নয়—স্কেট্স।' হাসল দ্বৈপায়ন।

'ওই হল।' গুটে বলল, 'তোমার মতো "জোনেক্স" কোম্পানির কিনব।'

'কিনিস। এখন শেখায় মন দে। বডিটা একদম স্ট্রেট রাখ—ডানদিক বাঁদিকে হেলাবি না।'

শিখতে-শিখতে সময় গড়াতে লাগল। রাস্তায় লোকজন আর গাড়ির সংখ্যা বাড়তে লাগল। একসময় দ্বৈপায়ন গুটেকে দাঁড় করিয়ে ওর পা থেকে রোলার স্কেটটা খুলে নিল। তারপর চেসিসটা নিজের পায়ের মাপে ঠিক করে নিয়ে দুটো স্কেটই পায়ে লাগিয়ে নিল।

এইবার গুটের হাত ধরে স্কেট করে চলতে শুরু করল দ্বৈপায়ন। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গুটে ছুটে চলল। ওর দিকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলল, 'হাঁপিয়ে গেলে বলবি, স্পিড কমিয়ে দেব।'

গুটে ছুটতে-ছুটতেই ঘাড় নাড়ল।

ঠিক তখনই নীলরঙের একটা মারুতি গাড়ি দ্বৈপায়নের ডান পাশে চলে এল, ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল।

দ্বৈপায়ন দেখল, গাড়িতে মাঝবয়েসী দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন ঃ একজন স্টিয়ারিং-এ, আর অন্যজন তাঁর পাশে।

জানলার পাশে বসা ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'ভাই, সি.ই.-১৬৫টা কোথায় পড়বে বলতে পারেন?'

সি.ই.-১৬৫ দ্বৈপায়নদের বাড়ির ঠিকানা। বাড়িটা পাঁচতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি, তাতে মোট দশটা ফ্ল্যাট আছে। এঁরা কাদের গেস্ট কে জানে!

দ্বৈপায়ন হাত নেড়ে ওঁদের বুঝিয়ে দিল, কীভাবে সামনের গোলচক্কর ঘুরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশ দিয়ে সি.ই.-১৬৫-তে পৌঁছতে হবে।

দ্বৈপায়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে মারুতিটা স্পিড নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গুটে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। গাড়িটা চলে যেতেই দ্বৈপায়নকে জিগ্যেস করল, 'দিপুদা, ওরা কাদের ফ্ল্যাট খুঁজছে? আমাদের?'

'না, না। এই সকালে কাদের ফ্ল্যাটে যাবে কে জানে!' গুটের কদমছাঁট মাথায় আদর করে এক চাঁটি মারল দ্বৈপায়ন ঃ 'নে চল—। দেরি হয়ে গেলে বউদি আবার বকাবকি করবে।'

গুটে হেসে বলল, 'মোটেই না। মা তোমাকে একটুও বকবে না। মা তোমাকে ভালোবাসে।'

গুটের শেষ কথাটা দ্বৈপায়নকে যেন একটা ধাক্কা দিল।

BanglaBook.org

বাড়ির কাছে এসে দ্বৈপায়ন দেখল, নীল মারুতিটা ওদের সদর দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। গুটে 'শক্তিমান' সিরিয়াল নিয়ে আপনমনে বকবক করে যাচ্ছিল। গাড়িটা দেখামাত্রই ও চুপ করে গেল। তারপর দ্বৈপায়নের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটা কী সুন্দর দ্যাখো! আমি বাপিকে বলেছি একটা নীল রঙের মারুতি কিনতে।'

দ্বৈপায়ন ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে পা থেকে রোলার স্কেট্স খুলতে লাগল।

তিনতলায় গুটেদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে ও দেখল দরজা সামান্য খোলা। ফাঁক দিয়ে বসবার ঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে সোফায় মারুতি গাড়ির একজন ভদ্রলোক বসে আছেন।

দ্বৈপায়ন 'বউদি' বলে ডেকে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তখনই ড্রইং স্পেসের সম্পূর্ণ ছবিটা ওর নজরে ধরা পড়ল।

নব্বই ডিগ্রি কোণে সাজানো দুটো সোফায় মারুতি গাড়ির দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁদের একজনের হাতে সিগারেট। ওদের সামনে আর-একটা সোফায় গুটের বাবা শান্তনু বসে আছে। তার ঠিক পিছনে গুটের মা সীমন্তিনী দাঁড়িয়ে।

দ্বৈপায়নের ডাকে সীমন্তিনী দরজার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। তখনই দ্বৈপায়ন খেয়াল করল সীমাবউদির মুখটা কেমন ফ্যাকাসে। মুখের সৌন্দর্যে আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা আঁচড় কেটেছে।

গুটে মাকে দেখামাত্রই বলে উঠল, 'আজ অনেকটা শিখে গেছি। দু-মাস পর আমি রোলার এস্কেট কিনব। তাই না, দিপুদা?'

দ্বৈপায়ন সীমার দিকে তাকিয়ে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল। গুটের কথায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, কিনিস। এখন ভেতরে যা— হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসে যা—।'

সীমাও ছেলেকে ভেতরে যেতে বলল। ওদের দিন-রাতের কাজের মেয়ে বাসন্তী একটু দূরে রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রং ময়লা। গায়ে রঙিন ফুল-ফুল ছাপা ফ্রক।

গুটে জুতো খুলে ওর কাছে চলে গেল।

দ্বৈপায়ন চলে আসতে যাবে, সীমন্তিনী ওকে ডাকল, 'দিপু, তুমি একটু থেকে যাও।' তারপর সোফায় বসা অপরিচিত দুই ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করে ও চাপা গলায় বলল, 'ওঁরা পুলিশের লোক...সল্ট লেক থানা আর লালবাজার থেকে এসেছেন।'

দ্বৈপায়নের ভুরু কুঁচকে গেল। ও সীমার আকুল মুখের দিকে দেখল।

BanglaBook.org

তারপর রোলার স্কেট-জোড়া দরজার একপাশে নামিয়ে রেখে ঢুকে পড়ল বসবার ঘরের এলাকায়।

সীমন্তিনী দ্বৈপায়নকে দেখিয়ে অপরিচিত দুই ভদ্রলাককে লক্ষ করে ইতস্তত করে বলল, 'ইনি দ্বৈপায়ন বসু—আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড—সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।'

দ্বৈপায়ন একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল।

যে-ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছিলেন তিনি কাঠ-কাঠ গলায় বললেন, 'আমার নাম অমল রায়—সল্ট লেক থানা, সাউথ। আর ইনি—' সঙ্গীর দিকে ইশারা করে ঃ 'বিজয় মিত্র—হোমিসাইড স্কোয়াড, লালবাজার। আমরা একটা ব্যাপারে শান্তনুবাবুকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি।'

দ্বৈপায়ন সাদা-পোশাকের দুই অফিসারকে বেশ খুঁটিয়ে দেখল।

অমল রায়ের গায়ের রং কালো, চোয়াড়ে চেহারা, মাথায় সামনের দিক থেকে টাক পড়তে শুরু করেছে, চোখ ছোট-ছোট। সব মিলিয়ে কেমন একটা রুক্ষ ভাব।

ওঁর সঙ্গী বিজয় মিত্রের ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বছর পঞ্চাশের মোটাসোটা ফরসা চেহারা, গোলগাল মুখে সবসময়েই এক টুকরো হাসি লেগে আছে, চোখে চশমা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, যথেষ্ট ভুঁড়ি আছে—দেখে মনে হয় ভোজনবিলাসী।

বাসন্তী ট্রে-তে করে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল সবার জন্য। সীমন্তিনী অতিথিদের অনুরোধ করল, 'নিন, চা খান।'

দ্বৈপায়নও চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল। তারপর শান্তনুর দিকে তাকাল।

শান্তনুর বয়েস সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ হবে—দ্বৈপায়নের চেয়ে বছর আট-নয়ের বড়। স্টেট ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে। তা ছাড়া মানুষটাও ভালো। সিগারেট আর তাস ছাড়া অন্য কোনও নেশা নেই। এই ফ্ল্যাটে এসেছে সাত-আট মাস। দ্বৈপায়নরা এই ফ্ল্যাট-বাড়ির সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা। তাই এই এলাকার যে-কোনও ব্যাপারে দ্বৈপায়নই ওদের গাইড।

কিন্তু পুলিশ হঠাৎ এখানে এসেছে কী ব্যাপারে?

সিগারেট শেষ করে অমল রায় টুকরোটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর শান্তনুকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা এ-ফ্ল্যাটে এসেছেন কতদিন?'

মনে-মনে হিসেব কষে নিয়ে শান্তনু বলল, 'প্রায় সাড়ে সাত মাস।'

'আপনাদের ফোন কি নতুন এসেছে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ—সবে মাসখানেক পেরিয়েছে।' শান্তনু সমর্থনের আশায় সীমার দিকে তাকাল।

সীমা ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে বলল, 'এখনও প্রথম বিল আসেনি।'

'আপনারা ফোন নাম্বার কাউকে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। নতুন ফোন এলে সেটাই তো স্বাভাবিক।'

শান্তনুর কথায় যে-খোঁচা ছিল সেটা অমল রায় গায়ে মাখলেন না। বিজয় মিত্র টেবিলে রাখা খবরের কাগজের হেডলাইনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিলেন। মনে-মনে কিছু ভাবছিলেন কি না বোঝা গেল না।

শান্তনুর দিকে না তাকিয়েই বিজয় মিত্র বললেন, 'একটা চিরকুটে আপনার নাম আর ফোন নাম্বার লিখে কাউকে দিয়েছিলেন?'

শান্তনু কেমন যেন দিশেহারা হয়ে ভাবতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে বলল, 'হয়তো দিয়েছি—স্পেসিফিক কিছু মনে পড়ছে না।'

বিজয় মিত্র স্বাভাবিক গলায় সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'রায়, চিরকুটটা ওঁকে দেখান।'

অমল রায় ব্যাজার মুখ করে তাঁর ছাইরঙা জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন। নিস্পৃহ মুখে খাম খুলে একটা চিরকুট বের করে এগিয়ে দিলেন শান্তনুর দিকে।

চিরকুট হাতে নেওয়ামাত্রই সবকিছু মনে পড়ে গেল শান্তনুর। ও মুখ ফিরিয়ে তাকাল দেওয়ালে ঝোলানো বড়-বড় তারিখ ছাপা একটা ক্যালেন্ডারের দিকে। ছবিহীন ক্যালেন্ডার, বারো মাসের জন্য বারোটা পৃষ্ঠা।

দ্বৈপায়ন গলা উঁচু করে চিরকুটের লেখাটা দেখতে চেষ্টা করল। শান্তনুর হাতের লেখা খুব সুন্দর। সেই সুন্দর হরফেই লেখা রয়েছে 'শান্তনু সেনগুপ্ত/ ৩৩৭-৪৫৩৬'।

ও শান্তনুকে উদ্দেশ করে চাপা গলায় বলল, 'শান্তনুদা, এটা তো আপনারই হাতের লেখা। কাকে লিখে দিয়েছিলেন মনে পড়ছে না?'

শান্তনু মাথা নাড়ল ঃ 'হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে। চিরকুটটা ওই ক্যালেন্ডরটার পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ওখান থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়েছিলাম।'

সঙ্গে-সঙ্গে সীমন্তিনীরও সবকিছু মনে পড়ে গেল। দ্বৈপায়ন লক্ষ করল, সীমার ফরসা মুখে হালকা গোলাপি ছোপ।

'নাম আর ফোন নাম্বারটা কাকে লিখে দিয়েছিলেন?' অমল রায় জিগ্যেস করলেন। তারপর চিরকুটটা শান্তনুর হাত থেকে নিয়ে উঠে গেলেন

BanglaBook.org

ক্যালেন্ডারটার কাছে। ছেঁড়া পাতাটা খুঁজে বের করে ওটা খাঁজে-খাঁজে মিলিয়ে পরখ করে দেখলেন।

শান্তনু বলল, 'দিন পনেরো আগে আমার এক বন্ধু এ-বাড়িতে এসেছিল। এই চিরকুটটা আমি ওকে দিয়েছিলাম।'

'বন্ধুর নাম কী?' বিজয় মিত্র নরম গলায় জানতে চাইলেন।

'পলাশ—পলাশ সান্যাল।'

অমল রায় বসবার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। সিগারেট ঠোঁটে নিয়েই জড়ানো স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'কীরকম বন্ধু?'

'কীরকম বন্ধু মানে?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল শান্তনু।

'আহা, রাগ করছেন কেন, মিস্টার সেনগুপ্ত!' বিজয় মিত্র পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন ঃ 'আমরা অ্যাকচুয়ালি আপনার বন্ধু সম্পর্কে একটু ইন্টারেস্টেড। তাই জানতে চাইছি। শুধু-শুধু এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন?'

অমল রায় ফিরে এসে সোফায় বসলেন এবং একইসঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'এক্সাইটেড হয়েও তো কোনও লাভ নেই! আমরা আমাদের কাজ করবই।' তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ঃ 'হ্যাঁ, মিস্টার সেনগুপ্ত, এবার বলুন—পলাশ সান্যাল সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

শান্তনু একটা সিগারেট ধরাল। ওর মাথার ভেতরটা কেমন করছিল। পলাশ সম্পর্কে ও কতটুকু জানে?

ভালো করে ভাবতে গিয়ে দেখল, প্রায় কিছুই না। পলাশ মেট্রোপলিটন স্কুলে ওর সঙ্গে পড়ত। ক্লাসে পলাশের সঙ্গে ওর তেমন একটা বন্ধুত্ব ছিল না। তারপর, স্কুল শেষ হতেই, ছাড়াছাড়ি। বিশ-বাইশটা বছর কোথা দিয়ে যেন গড়িয়ে গেছে। পলাশকে শান্তনু একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎই সেদিন—মাসদেড়েক আগে—সন্ধেবেলা উলটোডাঙা-ভি.আই.পি. রোডের মোড়ে পলাশের সঙ্গে আচমকা দেখা। শান্তনু পলাশকে একটুও চিনতে পারেনি। পলাশই ওকে নাম ধরে ডেকেছিল।

তারপর ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে স্কুলের গল্প, বন্ধুদের গল্প, স্যারদের গল্প। শেষ পর্যন্ত অচেনা মানুষটাকে শান্তনু পলাশ বলে মেনে নিয়েছিল।

কথায়-কথায় শান্তনু ওকে নিজের বিয়ের কথা, নতুন ফ্ল্যাট কেনার কথা বলেছিল। বলেছিল, 'একদিন সময় করে মিসেসকে নিয়ে চলে আয়।'

উত্তরে হেসে পলাশ বলেছিল, 'একদিন আসব—কারণ, আমার পিকিউলিয়ার জীবনটা এখনও "একলা চলো রে"।'

BanglaBook.org

শান্তনু ভাবেনি পলাশ সত্যি-সত্যিই ওর ফ্ল্যাটে আসবে।

কিন্তু পলাশ এসেছিল। প্রায় দু-ঘণ্টা ছিল। হাসি-ঠাট্টা-গল্পে সীমা আর মিমোকে একদম মাতিয়ে দিয়েছিল। ও চলে যাওয়ার পর সীমা বলেছিল, 'তোমার বন্ধু খুব মজার। ওঃ, কতদিন পর প্রাণ খুলে হাসতে পারলাম।'

পলাশকে ওরা সবাই আবার আসার জন্য বারবার করে বলেছিল। পলাশও কথা দিয়েছিল সুযোগ পেলেই আসবে। সীমা বলেছিল ফোন করে আসতে। কারণ, আগে থেকে জানা থাকলে ও পলাশকে রাতের খাওয়া খাইয়ে তবে ছাড়বে। পলাশ হেসে বলেছিল, 'সাহেবরা যাকে বলে ডিনার?' বলেই হো-হো করে গলা ফাটানো হাসি। তারপর ও কথা দিয়েছে, আবার আসবে।

সেদিন দু-ঘণ্টা আড্ডার পর স্কুলের পলাশ সান্যালকে যেন ধীরে-ধীরে খুঁজে পাচ্ছিল শান্তনু। স্কুলের সেই রোগা ময়লা চেহারার লাজুক ছেলেটাকে ও যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

তারপরই এখনকার পলাশের চেহারাটা ভেসে উঠল শান্তনুর চোখের সামনে। ভারি শরীর, মাথায় টাক, চোখে চশমা, কাঁচাপাকা গোঁফ। ঘন-ঘন সিগারেট খায়। কারণে-অকারণে দরাজ গলায় হেসে ওঠে। সব মিলিয়ে বেশ দিলখোলা বলে মনে হয়। তবে শান্তনু স্পষ্ট লক্ষ করেছিল, চশমার কাচের আড়ালে পলাশের চোখের মণি বেশ সতর্ক আর চঞ্চল—সবসময়েই কী যেন খুঁজছে।

পলাশের সঙ্গে এত গল্প করেছে ওরা, কিন্তু ওর সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি—কোথায় থাকে, কোথায় চাকরি করে, বাড়িতে আর কে-কে আছে।

সীমন্তিনী দু-একবার সেসব প্রসঙ্গ তুলেছিল বটে, কিন্তু পলাশের অন্য সব কথাবার্তায় সেগুলো চাপা পড়ে গেছে।

নাকি পলাশ ইচ্ছে করে সেসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে?

কিন্তু কেন?

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সীমন্তিনীর দিকে একবার তাকাল শান্তনু। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ও...আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত...হঠাৎ রাস্তায় দেখা...প্রায় বিশ বছর পর। একদিন মাত্র এখানে এসেছিল...তেমন একটা কিছু...ইয়ে...মানে, জানা হয়নি।'

অমল রায় ও বিজয় মিত্র এরপর নোট প্যাড বের করে শান্তনু আর সীমন্তিনীকে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর দরকার মতো প্যাডে নোট নিতে লাগলেন।

দ্বৈপায়ন হতবাক হয়ে গোটা ব্যাপারটার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

BanglaBook.org

ওঁদের জিজ্ঞাসাবাদের ধকল শেষ হলে সীমা প্রশ্ন করল, 'পলাশদার কি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?'

'অ্যাক্সিডেন্ট!' বিজয় মিত্র হেসে ফেললেন ঃ 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়, ম্যাডাম। সেরকম হলে আমরা ফোন করেই কাজ সেরে নিতাম, সাতসকালে কষ্ট করে এসে আপনাদের বিরক্ত করতাম না।' মিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঃ 'ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। একইসঙ্গে বিপজ্জনক...আপনাদের পক্ষে...।'

দ্বৈপায়ন উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। ও আর থাকতে না পেরে বলল, 'প্লিজ, ব্যাপারটা আমাদের খুলে বলুন—।'

বিজয় মিত্র অমল রায়ের দিকে তাকালেন, একটু সময় নিয়ে বললেন, 'রায়, আপনাকে তো সব বলেছি, আপনিই ব্যাপারটা ওঁদের খোলসা করে বলুন।'

অমল রায় টেবিলে বারকয়েক টোকা মেরে মাথা নাড়লেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, আপনারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন নিশ্চয়ই, কিন্তু একটা খবর খেয়াল করেছেন কি না জানি না। গত ছ'মাসে কলকাতায় তিন-তিনটে রেপ অ্যান্ড মার্ডারের ঘটনা ঘটেছে। প্রথমটা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, দ্বিতীয়টা কসবায়, আর শেষ ঘটনাটা মাত্র চারদিন আগের—মানে, গত শনিবার রাতে ইস্টার্ন বাইপাসের চিংড়িঘাটা এলাকায় হয়েছে।

'তিনটে ঘটনার মধ্যে এমন কিছু-কিছু মিল আমরা খুঁজে পেয়েছি যাতে মনে হয় কাজটা একই লোকের। যেমন, তিনটে ঘটনাই ঘটেছে সন্ধের পর, রাতে। অবশ্য এটা নেহাতই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এসব অপকর্ম অন্ধকারেই হবে। তবে দ্বিতীয় মিলটা বেশ অদ্ভুত। রেপ করে মার্ডার করার পর মার্ডারার মেয়েগুলোর পোশাক-আশাক আবার বেশ সময় নিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে। এছাড়া তিনজনেরই গলায় আর গালে কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আর প্রত্যেককে খুন করা হয়েছে গলা টিপে।

'তিনজন ভিকটিমের গড় বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। তিনজনেরই বেশ অ্যাট্রাক্টিভ চেহারা ছিল। ফোরেনসিক রিপোর্টে তিনটে কেসের মধ্যে আরও অনেক সিমিলারিটি পাওয়া গেছে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, তিনটে রেপ অ্যান্ড মার্ডার একই লোকের কাজ। এ-ব্যাপারে এখনও আমরা কাউকে ট্র্যাক ডাউন করতে পারিনি বলে লালবাজারের হোমিসাইড স্কোয়াড বেশ অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে।'

অমল রায় একটু থামলেন। সিগারেটে কয়েকবার গভীর টান দিলেন। অনুসন্ধানী নজরে শান্তনু, সীমন্তিনী আর দ্বৈপায়নকে জরিপ করলেন। যেন ওদের

BanglaBook.org

প্রতিটি অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি মানে বুঝে নিতে চাইলেন। তারপর সামান্য কেশে নিয়ে কথায় খেই ধরে বলতে শুরু করলেন ঃ

'চিংড়িঘাটার কেসটা আপনাদের একটু বলি। যে-মেয়েটি মারা গেছে—ঝরনা সামন্ত—ও কাছাকাছি একটা ঝুপড়িতে থাকত। গায়ের রং কালো হলেও চেহারা নজর কাড়ার মতো। সন্ধের পর ও যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে খালধারে বোধহয় শুকনো ডালপালা জোগাড় করতে গিয়েছিল—কারণ, ওর সঙ্গে একটা বস্তা ছিল। আপনারা ওদিকটায় কখনও গেছেন কিনা জানি না, তবে জায়গাটা ভীষণ নির্জন—তা ছাড়া ওখানে একটা খাল আছে, খালের ধারে অনেক আগাছা আর গাছের ভিড়—জঙ্গলের মতন। সেদিন খালের বাঁদিকটায় কাছাকাছি একটা বিশাল জমির আগাছা সাফ করার জন্যে কিছু লেবার সেই আগাছায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে দাবানলের মতো দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল সেখানে। স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা সেই আগুন দেখতে ভিড় করেছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঝরনা সেখানে ছিল। তখন সময় প্রায় সাড়ে ছ'টা হবে। শীতের সময়...বুঝতেই পারছেন, সাড়ে ছ'টা মানে বেশ অন্ধকার। তার ওপর আগুন নিভতে আরও কিছুটা সময় লেগেছিল।'

সিগারেট শেষ হয়ে আসায় অমল রায় জ্বলন্ত টুকরোটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আগুন নিভে যাওয়ার পর জায়গাটা আবার নির্জন অন্ধকার হয়ে যায়। তখন ঝরনা বোধহয় খালধারের দিকে চলে যায়। ব্যস, তারপর সব শেষ।'

শান্তনু, সীমন্তিনী আর দ্বৈপায়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অমল রায়ের কথা শুনছিল। তিনি থামতেই দ্বৈপায়ন জিগ্যেস করল, 'কিন্তু শান্তনুদা এর মধ্যে এল কোত্থেকে?'

সামান্য হাসলেন অমল রায়, তারপর বললেন, 'ডেডবডির শাড়ির ভাঁজে আমরা এই চিরকুটটা পেয়েছি। এটার কথা আমরা মিডিয়াকে ফ্ল্যাশ করিনি। এই সিরিয়াল কিলার ও রেপিস্টকে ধরার এটাই একমাত্র পজিটিভ ক্লু। এই সূত্র ধরেই কেসগুলো আমরা সল্‌ভ করতে চাই।'

বিজয় মিত্র এবার মুখ খুললেন, 'আমাদের বিশ্বাস আপনার স্কুলের বন্ধু পলাশ সান্যালই হল আসল কালপ্রিট। আর তাকে ধরতে হলে আপনাদের সাহায্য আমাদের কাছে ভীষণ জরুরি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিত্র, তারপর ঃ 'ব্যস, এই হল পুরো গল্প।'

সীমন্তিনীর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। অর দ্বৈপায়নের

BanglaBook.org

বুকের ভেতরে গুড়গুড় করে যেন ঢাক বাজতে শুরু করল। পলাশ সান্যালকে ও কখনও দ্যাখেনি। কিন্তু একজন রেপিস্ট ও মার্ডারার শান্তনুদার স্কুলের বন্ধু এটা ভাবতেই ওর কেমন লাগছিল।

সীমা বিজয় মিত্রের কাছাকাছি এগিয়ে এল, অসহায়ভাবে জিগ্যেস করল, 'আমরা তা হলে এখন কী করব?'

শান্তনু একমনে সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছিল, ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে ছিল সামনের খোলা জানলার দিকে। বোধহয় পলাশের নতুন অবিশ্বাস্য চেহারাটার কথা ভাবতে চাইছে।

টেবিলে রাখা খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করতে-করতে বিজয় মিত্র বললেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, আমরা আপনাদের ওপর খুব ডিপেন্ড করছি। আপনি ফোন নাম্বারটা পলাশ সান্যালকে লিখে দিয়েছেন দিন পনেরো আগে, আর সেটা আমরা পেয়েছি মাত্র চারদিন আগে—মার্ডার স্পটে। চিরকুটটা দশদিনেরও বেশি সময় ধরে কেন পলাশবাবুর পকেটে ছিল বলতে পারব না। তবে এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, পলাশবাবুর কাছ থেকে ওটা চলে গেছে আসল মার্ডারারের কাছে, আর পলাশবাবু নির্দোষ। উঁহু—' মাথা নাড়লেন ঘন-ঘন ঃ 'হি ইজ আওয়ার গাই। যেহেতু আমাদের কাছে আর কোনও ক্লু নেই তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও পথও নেই।'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে শান্তনু এবার নড়েচড়ে বসল ঃ 'কীসের অপেক্ষা?'

'পলাশ সান্যাল কবে আবার আপনাদের ফোন করে, বা আপনাদের বাড়িতে আসে—তার অপেক্ষা।'

'আপনার কী মনে হয় ও ফোন করবে বা আসবে?'

'আমার মন বলছে সে আসবে...,' চোখ তুলে সীমন্তিনীর দিকে একপলক তাকালেন বিজয় মিত্র ঃ 'কারণ আপনার স্ত্রী সুন্দরী। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সেনগুপ্ত—রেপিস্টদের সাইকোলজি যা একটু-আধটু ঘেঁটে দেখেছি তাতে বুঝেছি ওদের মধ্যে মাঝে-মাঝে লোভ মাথাচাড়া দেয়—সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গ পাওয়ার লোভ। কেউ-কেউ আবার হঠাৎ-হঠাৎ ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। পলাশ সান্যাল কী টাইপের জানি না, তবে সে যদি যোগাযোগ করে তা হলে আমি মোটেই অবাক হব না।'

'চিরকুটটা তো ওর কাছে আর নেই। ফোন নাম্বারটা ওর কি মনে থাকবে?' আমতা-আমতা করে শান্তনু প্রশ্ন করল। ওর মুখের রং কিছুতেই ফিরে আসছে না।

BanglaBook.org

'থাকতেও পারে। হয়তো আগেই অন্য কোথাও টুকে রেখেছে।'

'যদি পলাশদা আবার ফোন করে বা হঠাৎ চলে আসে তা হলে কী করব?' সীমন্তিনী ভয়ের গলায় জিগ্যেস করল।

'দুটো ফোন নাম্বার আপনাদের দিচ্ছি। পলাশ সান্যাল এলে তাকে যে-কোনও ছলছুতোয় আটকে রাখবেন। আর এক ফাঁকে এই দুটো নাম্বারের একটায় আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। আমাকে না পেলে ফোনে আপনাদের নাম বলে মেসেজটা দিয়ে দেবেন—বলবেন ইমারজেন্সি—তা হলেই ওরা আমাকে মোবাইল নাম্বারে কনট্যাক্ট করে নেবে।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তাতে ফোন নম্বরগুলো লিখলেন বিজয় মিত্র। তারপর কার্ডটা শান্তনুর হাতে দিলেন।

কার্ডটা নিতে গিয়ে শান্তনুর হাতটা সামান্য কেঁপে গেল। পলাশকে ও একজন ভয়ঙ্কর রেপিস্ট ও নৃশংস খুনি হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করল।

বিজয় মিত্র ও অমল রায় উঠে দাঁড়ালেন।

সকলেরই মুখ থমথমে—যেন এইমাত্র কোনও শোকসভা শেষ হল।

দরজার কাছে পৌঁছে সীমন্তিনীর ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকালেন বিজয় মিত্র। স্মিত হেসে বললেন, 'ভয় পাবেন না, মিসেস সেনগুপ্ত—আমরা তো আছি। তবে পলাশ সান্যালকে ধরাটা খুব ভাইটাল—নইলে আরও বহু মেয়ের সর্বনাশ হবে। কারণ, লোকটার কোনও বাছবিচার নেই। ওর প্রথম ভিকটিমের বয়েস ছিল মাত্র ষোলো—ফুটফুটে এক কিশোরী...।'

সীমন্তিনীর কানে হঠাৎই এক অলৌকিক সাইরেন বেজে উঠল। ওর মাথাটা কেমন চক্কর দিল। তারই মধ্যে আবছাভাবে বিজয় মিত্রের শেষ কথাটা শুনতে পেল ও।

'আপনাদের ওপরে আমরা খুব ডিপেন্ড করছি কিন্তু—।'

আরও কুড়িদিন কেটে যাওয়ার পর, শান্তনু আর সীমন্তিনী যখন ভাবতে শুরু করেছে পলাশ আর কখনও যোগাযোগ করবে না, ঠিক সেই সময়ে পলাশের ফোনটা এল।

রোজ সকাল ন'টার মধ্যে শান্তনু অফিসে বেরিয়ে যায়। তখন একঘণ্টা সময় হাতে পায় সীমন্তিনী। তারপর, দশটা বাজলেই, ও গুটেকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। রান্নার ঝামেলা সকালেই প্রায় মিটে যায়। যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু সীমা সেরে নেয় এগারোটার পর।

BanglaBook.org

বসবার ঘরে বসে সীমা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে 'কুছ-কুছ হোতা হ্যায়' ছবির গান শুনছিল। বাসন্তী বাথরুমে কাপড় কাচছে—কলের জল পড়ার আওয়াজ, কাপড় কাচার শব্দ, সবই শোনা যাচ্ছে এ-ঘর থেকে।

এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

টেপ রেকর্ডারের গানের কলি কানে আসছিল সীমার।

'তুম পাস আয়ে
ইঁয়ু মুসকুরায়ে
তুমনে না জানে কেয়া
সপনে দিখায়ে...'

ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। ও যার কথা ভাবছে নিশ্চয়ই সে এসেছে।

দরজা খুলতেই সীমা দেখল ওর অনুমান সত্যি। দ্বৈপায়ন দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওর মাথার ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো। ফরসা সজীব মুখে সরল হাসি। পরনে কট্‌সউল জাতীয় কাপড়ের চেক-চেক টি-শার্ট আর নীল রঙের জিন্‌স। পায়ে রোলার স্কেট্‌স লাগানো। ওর শরীর চাবুকের মতো টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন যে-কোনও লড়াইয়ের জন্য তৈরি।

'এসো, ভেতরে এসো—।' দ্বৈপায়নকে ভেতরে ডাকল সীমন্তিনী। ওর বুকের ভেতরে উলটোপালটা কীসব হচ্ছিল যেন।

দ্বৈপায়ন চাকা গড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই সীমা দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর টেপটা অফ করে দিয়ে মজা করে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, পায়ে চাকা লাগানো কেন?'

দ্বৈপায়ন টেপের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুনগুন করল, 'কুছ-কুছ হোতা হ্যায়।' তারপর সীমার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'বহুদিন চেষ্টার পর স্কেট্‌সে একটা নতুন কায়দা রপ্ত করেছি—সেটা তোমাকে দেখাতে এলাম।'

'কী কায়দা?'

'আমি নাম দিয়েছি "ল্যাক্‌টো বনবন"। এই দ্যাখো—।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই দ্বৈপায়ন চাকা গড়িয়ে ডাইনিং স্পেস, করিডর আর বসবার ঘরে ঘুরতে লাগল। এইভাবে পথ চলে গতি বেশ খানিকটা বাড়তেই ও সীমার কাছাকাছি এসে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। দ্বৈপায়নের শরীরটা অনেকটা ব্যালে নাচিয়ের মতো বনবন করে ঘুরতে শুরু করল।

বেশ কয়েক পাক ঘোরার পর দ্বৈপায়ন কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, সীমা কোনও কিছু না ভেবেই ওকে ধরে ফেলল।

দ্বৈপায়ন পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল, আর খুব কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছিল সীমন্তিনীর নিটোল মুখ। ওর হাত দ্বৈপায়নের বাহু আঁকড়ে ধরেছে। টানা-টানা চোখে স্পর্শকাতর আকুতি।

দ্বৈপায়ন নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, 'থ্যাংক য়ু, বউদি। দেখছি "ল্যাক্‌টো বনবন" টা এখনও আমার ভালো করে রপ্ত হয়নি।'

সীমার ফরসা মুখে লালচে আভা। এক অদ্ভুত চোখে ও দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছিল। আগুনের হলকা টের পাচ্ছিল কানে—যেন রাবণের চিতা জ্বলছে।

সীমা নিচু গলায় বলল, 'তোমার জন্যে একটু মিষ্টি আনাই।'

দ্বৈপায়ন বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সীমা 'বাসন্তী! বাসন্তী!' বলে ডেকে উঠল। তারপর দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মিষ্টিটা হচ্ছে তোমার ওই "ল্যাক্‌টো বনবন"-এর প্রাইজ।'

কাপড় কাচা ছেড়ে বাসন্তী হাত মুছতে-মুছতে এসে দাঁড়াল। সীমন্তিনীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল মিষ্টি নিয়ে আসতে।

মিষ্টির দোকান অনেক দূরে। দ্বৈপায়ন জানে, বাসন্তীর মিষ্টি নিয়ে ফিরতে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগবে। ওর কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল।

বাসন্তী চলে যেতেই সীমা দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে দাঁড়াল দ্বৈপায়নের মুখোমুখি। সরাসরি তাকিয়ে রইল ওর চোখে।

দ্বৈপায়ন অস্বস্তি পাচ্ছিল। সীমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল বারবার।

সীমা জিগ্যেস করল, 'দিপু, তোমার কাছে আমার কোনও দাম নেই?'

'আছে।' ঘাড় নেড়ে বলল দ্বৈপায়ন।

'তা হলে আমাকে নাম ধরে ডাকো।'

দ্বৈপায়ন মাথা নিচু করে রইল।

'ডাকো। নইলে আমার দিব্যি—।'

ইতস্তত করে দ্বৈপায়ন নিচু গলায় বলল, 'সীমা।'

'ওরকম না। পুরো নাম।' সীমা জেদের সুরে বলল।

'সীমন্তিনী—।' আলতো করে বলল দ্বৈপায়ন।

BanglaBook.org

দ্বৈপায়নের গালে আঙুল ছোঁয়াল সীমা। ওর দিকে মুখ তুলে বলল, 'দিপু, তুমি আমাকে ভালোবাসো না?'

দ্বৈপায়নের চোখ জ্বালা করছিল, বুকের ভেতরে ষাঁড়ের লড়াই চলছিল, গলাটা কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল। ও কোনওরকমে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসি, শান্তনুদাকে ভালোবাসি, গুটেকেও ভালোবাসি।'

হাত সরিয়ে নিল সীমা। অভিমানের গলায় বলল, 'সবাইকে ভালোবাসার কথা বলছি না। আমি শুধু আমাকে ভালোবাসার কথা বলছি।'

'সেটা হয় না।' নরম গলায় বলল দ্বৈপায়ন, 'তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি—তবে সেটা একটু অন্যরকম ভালোবাসা। আমার কোনও লাভার নেই। কেউ-কেউ ইন্টারেস্ট দেখালেও আমার মনে ধরেনি। কিন্তু তোমাকে আমার ভীষণ পছন্দ। শান্তনুদার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। হয়তো তোমারটাও—।'

সীমন্তিনী কেঁদে ফেলল, নির্লজ্জভাবে জাপটে ধরল দ্বৈপায়নকে। ওর বুকের আড়াল থেকে গোঙানির মতো 'দিপু! দিপু!' করে ডেকে উঠছিল বারবার।

সীমার ভারে দ্বৈপায়নের রোলার স্কেট্‌সের চাকা সামান্য গড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা পা আড়াআড়িভাবে সামান্য ঘুরিয়ে দ্বৈপায়ন সেটা রুখে দিল। তারপর একটু সময় দিয়ে সীমাকে সোজা করে দাঁড় করাল। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'সীমা, ভালোবাসা অনেক বড় ঠিকই, তবে বিশ্বাস বোধহয় তার চেয়েও বড়।'

সীমা সামনের একটা সোফায় মাথা নিচু করে বসে পড়ল, বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি যে কী করেছ আমাকে! আমি কিছুতেই নরমাল হতে পারছি না। সবসময় তোমার কথা মনে পড়ে, তোমাকে চোখের সামনে দেখতে পাই।' কান্না চাপার চেষ্টা করল সীমা, তারপর ভেজা চোখ তুলে দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিপু, তুমি এত ভালো কেন? আমার কষ্ট তুমি বুঝতে পারো না?'

দ্বৈপায়ন সীমার কাছে সরে এসে বলল, 'বুঝতে পারি। পারি বলেই আমার কষ্টটাও তোমাকে বোঝাতে চাই।'

কলিং বেল বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল সীমা। দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল দ্বৈপায়ন।

বাসন্তী মিষ্টি নিয়ে ফিরে এসেছে।

BanglaBook.org

মিষ্টির বাক্সটা বাসন্তীর হাত থেকে নিয়ে দ্বৈপায়ন বাক্স খুলল। তারপর 'প্রাইজ খেয়ে নিলাম' বলে একটা সন্দেশ টপ করে মুখে পুরে দিল।

বাক্সটা সীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়ানো গলায় ও বলল, 'এই নাও, বাকি প্রাইজগুলো গুটের জন্যে—।'

বাসন্তী দ্বৈপায়নের কাণ্ড দেখে মিটিমিটি হাসছিল। সীমা একটা সন্দেশ বাসন্তীকে দিয়ে বলল, 'এটা খেয়ে নে—।'

সন্দেশটা নিয়ে সীমাকে বলে বাসন্তী বাথরুমের দিকে চলে গেল।

আর ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

সীমা উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

'হ্যালো—।'

'পলাশ সান্যাল বলছি।' ও-প্রান্ত থেকে পলাশের হাসিখুশি স্বর শোনা গেল।

চোখের পলকে সীমার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। এতদিন ধরে ও আর শান্তনু প্রতিটি মুহূর্তে পলাশের ফোনের জন্য অপেক্ষা করেছে। শান্তনু রোজ অফিসে গিয়ে সকাল-বিকেল বাড়িতে ফোন করেছে। জানতে চেয়েছে, পলাশের ফোন এসেছে কি না। ওই দুই অফিসারের কাছে পলাশের ব্যাপারে সবকিছু শোনার পর শান্তনু এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, ও কিছুদিন অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সীমা সেটা হতে দেয়নি। বহু তর্ক-বিতর্কের পর ও শান্তনুকে অফিস যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে পেরেছিল। ও বলেছিল, দ্বৈপায়ন যখন আছে তখন শান্তনুর অফিস কামাই করার দরকার নেই।

দ্বৈপায়নের বাবার ইলেকট্রনিক্সের বিশাল ব্যবসা। ধর্মতলায় ওদের অফিস। দ্বৈপায়ন বি.এস.সি পাশ করার পর বাবার সঙ্গে খানিকটা সময় ব্যবসা দেখাশোনা করে, আর বাকি সময়টা নিজের মতো করে কাটায়। গত পনেরো বছর ধরে ও রোলার স্কেট্‌স পাগল। আর বছরচারেক হল কাছাকাছি এক বন্ধুর বাড়ির গ্যারেজে একটা জিমনাশিয়াম খুলেছে। সেখানে ইজি-ক্রাঞ্চ, ফ্লেক্সিবার, স্লিম ডিস্ক, টামি ট্রিমার, সুপার হাইট ইত্যাদি নানান ব্যায়ামের যন্ত্র রয়েছে। দ্বৈপায়ন সারাটা দিনই প্রায় রোলার স্কেট্‌স আর জিম নিয়ে মেতে থাকে। নেহাত বাবাকে শান্ত রাখতে ও ব্যবসার পিছনে কিছুটা সময় দেয়। এ ছাড়া ওর চলাফেরার সঙ্গী হল একটা মোটরবাইক। হয় মোটরবাইক নয় রোলার স্কেট্‌স চড়ে দ্বৈপায়ন সবসময় ঘুরে বেড়ায়। শান্তনু ওকে ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার তো সবসময় হয় দু-চাকা নয় আট চাকা। ভগবান ভদ্রলোকের

BanglaBook.org

উচিত ছিল একেবারে গোড়া থেকেই পায়ে চাকা লাগিয়ে তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানো।'

বাজপাখির তাড়া খাওয়া চড়ুইয়ের মতো উদভ্রান্ত চোখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল সীমা। ওই তো উৎকণ্ঠা-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিপু। শান্তনু এই মুহূর্তে পাশে নেই তো কী হয়েছে! দিপু তো আছে!

কিন্তু পলাশের কথা আবার শুরু হতেই সীমন্তিনীর সব ভরসা যেন উবে গেল।

'কী ব্যাপার, চুপ করে গেলে যে! চিনতে পারছ না নাকি! আমি পলাশ—তোমার বোকা-বোকা হাজব্যান্ড শান্তনুর ক্লাসফ্রেন্ড।'

সীমা সংবিৎ ফিরে পেল। দ্বৈপায়নের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। চিনতে পারব না কেন! উঃ, কতদিন পর আপনি ফোন করলেন! কিন্তু...কিন্তু ও তো এখন নেই... অফিসে গেছে...।'

'আজ কাজের দিন, অফিসে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।' ভরাট গলায় হাসল পলাশ ঃ 'সেইজন্যেই তো ওর সুন্দরী বউকে একা পেয়ে ফোন করছি। কেমন আছ তুমি, সীমন্তিনী?'

শান্তনুকে দেখা-শোনা করে বিয়ের আগে সীমার কোনও প্রেমিক ছিল না। তবুও ওর মনে হল, পলাশের প্রশ্নের ধরনটা যেন প্রাক্তন প্রেমিকের মতো।

ও অস্বস্তি-ভরা সুরে কোনওরকমে জবাব দিল, 'ভালো আছি। আপনি?'

টেলিফোনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পলাশ ঃ 'আমি ভালো নেই। আমার মাথায় একটা পিকিউলিয়ার ব্যথা হয়...সেটা ক'দিন ধরে খুব উৎপাত করছে।'

দ্বৈপায়ন সীমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। টেলিফোনের রিসিভারের কাছে কান পেতে ও-প্রান্তের কথা শুনতে চেষ্টা করল।

সীমা তখন টেলিফোন নম্বর লেখা চিরকুটটার কথা ভাবছিল। ওটা তো পলাশ হারিয়ে ফেলেছে! তা হলে এখন ফোন করল কেমন করে? নম্বরটা কি ও মুখস্থ করে নিয়েছিল? নাকি অন্য কোথাও টুকে রেখেছিল?

এইসব ভাবতে-ভাবতেই সীমন্তিনীর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কথাটা।

'আমাদের ফোন নাম্বারটা আপনার মনে ছিল?'

'কেন? এ-কথা বলছ কেন?' পলাশ অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'চিরকুটটা তো আপনি হারিয়ে ফেলেছেন—।' কথাটা মুখ দিয়ে বেরোনোমাত্রই সীমার বুকের ভেতরে আচমকা যেন বাজ পড়ল।

ও-প্রান্তে পলাশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আরও অবাক হয়ে

BanglaBook.org

সন্দেহের গলায় জিগ্যেস করল, 'ওটা হারিয়ে গেছে তুমি জানলে কেমন করে?'

শীতের মধ্যেও সীমার কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠল। ওর বুকের ভেতরে বরফের মতো ঠাণ্ডা জটিল জলস্রোত ঘুরপাক খেতে লাগল। ও অসহায়ভাবে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল। দ্বৈপায়ন ওকে তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়ার জন্য ইশারা করল।

সীমা কোনওরকমে বলল, 'ক্যালেন্ডারের পাতা ছেঁড়া ওইটুকুন এটা চিরকুট...আমি...আমি জানতাম ওটা হারিয়ে যাবে। তাই...ইয়ে...আন্দাজে বললাম। কেন, সত্যি-সত্যি হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর পলাশ জবাব দিল, 'হুঁ...তুমি ঠিকই ধরেছ। ওটা হারিয়ে ফেলেছি। তবে কোথায় যে হারালাম...কে জানে!'

দ্বৈপায়ন সীমার বাহুতে হাত রাখল। টের পেল সীমা ভয়ে কাঁপছে। ও সীমাকে ছুঁয়ে থেকে ভরসা দিতে চাইল। ওর কানের খুব কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওঁকে বাড়িতে আসতে বলো। মনে নেই সেদিন অমল রায় কী বলে গেলেন! কুইক...।'

সীমা কোনওরকমে হেসে বলল, 'প্রথমদিন আলাপ করেই বুঝেছিলাম আপনি খুব ভুলোমনের মানুষ। সেই যে চলে গেলেন আর কোনও পাত্তাই নেই! কবে আসছেন বলুন। আপনাকে খাওয়ানোটা তো এখনও বাকি থেকে গেল—সাহেবরা যাকে বলে ডিনার।'

ও-প্রান্তে হেসে উঠল পলাশ। সীমার মনে হল, ও যেন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

পলাশ বলল, 'তোমাদের ওখানে যাব তো নিশ্চয়ই...তবে আজ নয়। কোনও চিন্তা নেই তোমার—ফোন করে যাব।'

সীমা হঠাৎই ছোট মেয়ের মতো বায়নার সুরে বলল, 'না, না, ওরকম বললে হবে না। আজকেই কথা দিতে হবে কবে আসছেন।'

সীমা দিনক্ষণটা জানতে চাইছিল। সেটা জানতে পারলে পুলিশের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করতে সুবিধে হবে। উৎকণ্ঠার মধ্যেও দ্বৈপায়নের আশ্বাস ওর ভালো লাগছিল।

পলাশ হেসে বলল, 'তোমাকে কথা দিচ্ছি যাব, তবে কবে কখন যাব এক্ষুনি হুট করে বলতে পারছি না। মাথার ব্যথাটা বড্ড ট্রাবল দিচ্ছে। যাকগে, শান্তনুকে বোলো আমি ফোন করেছিলাম—।' হঠাৎই ফোন রেখে দিল পলাশ।

বিমূঢ় ভয়ার্ত চোখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল সীমন্তিনী।

BanglaBook.org

দ্বৈপায়ন তখন পলাশ সান্যালের চেহারাটা সামনে দেখতে পাচ্ছিল। পুলিশ অফিসারদের কাছে পলাশের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল শান্তনু। তখন থেকেই ওর একটা ছবি তৈরি হয়েছে দ্বৈপায়নের মনে। সেই টাক-মাথা ভারি চেহারার লোকটাকে ওর ভয়ঙ্কর এক শত্রু বলে মনে হচ্ছিল।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দ্বৈপায়নের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সীমা জিগ্যেস করল, 'কী করব এখন?'

'খুব সিম্প্‌ল। শান্তনুদাকে অফিসে ফোন করে খবরটা জানাও। তারপর লালবাজারে ফোন করে বিজয় মিত্রকে জানাও। দরকার হলে ওঁরা তোমাদের ফোন ট্যাপ করবেন। বুঝতেই পারছ, পলাশ সান্যাল ইজ আ ভেরি ডেঞ্জারাস ম্যান।'

সীমা তাড়াতাড়ি ফোন নম্বরগুলো খুঁজে বের করল। দ্বৈপায়ন ওর হয়ে ডায়াল করে দিল। শান্তনু খবরটা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সীমা ওকে ভরসা দিল। বলল, দ্বৈপায়ন আছে, ভয়ের কিছু নেই। ও এখন স্কুল থেকে মিমোকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে।

লালবাজারে ফোন করে বিজয় মিত্রকে পাওয়া গেল। তিনি শান্তস্বরে জানালেন, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওঁরা পুলিশের আর্টিস্ট দিয়ে পলাশ সান্যালের একটা ছবি আঁকিয়ে রাখছেন। সেটা শান্তনুদের দিয়ে চেক করিয়ে ফাইনাল করবেন। তারপর সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে টিভিতে ছবিটা প্রচার করে পলাশ সান্যালের খোঁজ করবেন। শুধুমাত্র সন্দেহ বা অনুমানের ওপরে নির্ভর করে এক্ষুনি টিভি ব্রডকাস্টে যাওয়া ঠিক হবে না।

আর টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যাপারে বিজয় মিত্র বললেন, 'পলাশ সান্যাল তো রেগুলার আপনাকে ফোন করছে না। রেগুলার আপনাদের ফোন করা শুরু করলেই আমাদের জানাবেন—তখন লাইন ট্যাপিং-এর ব্যবস্থা করব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিজয় মিত্র ঃ 'ট্যাপ করেও তেমন একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। দেখব হয়তো পাবলিক ফোন কি এস.টি.ডি. বুথ থেকে ফোন করছে। ও. কে., মিসেস সেনগুপ্ত, রাখছি।'

ফোন রেখেই হাতঘড়ির দিকে তাকাল সীমা। তাকিয়েই আঁতকে উঠল। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। ছুটির সময় ওর যেতে দেরি হলে মিমো ভীষণ ঝামেলা করে।

বাসন্তীকে বলে দ্বৈপায়নের সঙ্গেই ও ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এল। ছোট্ট করে দ্বৈপায়নকে জিগ্যেস করল, 'তুমি সঙ্গে যাবে নাকি?'

দ্বৈপায়ন রোলার স্কেট্‌সটা পা থেকে খুলতে-খুলতে বলল, 'যেতে ইচ্ছে

BanglaBook.org

করছে, তবে উপায় নেই। সাড়ে দশটায় ড্যাডির সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। না গেলে ড্যাডি খুব খেপে যাবে। সন্ধের পর বরং আসব।'

সীমা সিঁড়ি নামতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে দ্বৈপায়ন বলল, 'আর-একবার নাম ধরে ডাকব?'

সীমা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও চকিতে চোখ বুলিয়ে সিঁড়ির ওপর-নীচটা দেখল। কেউ নেই। তখন ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

দ্বৈপায়ন জিগ্যেস করল, 'পুরো নাম?'

সীমা হেসে ঘাড় কাত করল।

'সীমন্তিনী—।' আলতো করে ডাকল দিপু। তারপরই ওদের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল ঠকঠক করে।

দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে কিশোরী হয়ে হাসল সীমা। তারপর যেন হাওয়ায় ভেসে সিঁড়ি নামতে শুরু করল। দ্বৈপায়নের আলতো ডাকটা ওকে রেশমের শাড়ির মতো সর্বক্ষণ জড়িয়ে রইল। মিমোর স্কুলে পৌঁছনো পর্যন্ত সেই ডাকটা ও শুনতে পাচ্ছিল।

একদিন সন্ধ্যায় শান্তনুদের ফ্ল্যাটে পলাশ সান্যাল এসে হাজির হল আগাম কোনও খবর না দিয়েই।

পলাশ শেষ যেদিন ফোন করেছিল তারপর সাত-সাতটা দিন সহজ-সরলভাবে কেটে গেছে। শান্তনুরা আবার ভাবতে শুরু করেছিল পলাশ আর কোনওদিনই ওদের বাড়িতে আসবে না। সীমন্তিনী এও ভাবতে শুরু করেছিল, পলাশ হয়তো সত্যি-সত্যিই অপরাধী নয়—পুলিশ মিছিমিছি ওকে সন্দেহ করছে।

ঠিক এরকমই একটা নিশ্চিন্ত অবস্থার মাঝে পলাশ এসে হাজির হল। এবং প্রমাণ করে দিল, বিজয় মিত্র বা অমল রায়ের ধারণায় কোনও ভুল ছিল না।

সীমন্তিনী সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। অথচ তার আগে ও, শান্তনু আর দ্বৈপায়ন মিলে কত পরিকল্পনাই না করেছে!

পলাশ এলে কীভাবে ওরা বিজয় মিত্রকে খবর দেবে। শান্তনু যদি বাড়ি না থাকে তা হলে সীমা কী করে ওকে বোঝাবে যে, পলাশ ওদের ফ্ল্যাটে আছে। পলাশ এলে দ্বৈপায়নকেও খবরটা জানানো দরকার—ওকে কীভাবে জানানো হবে। মিমোকে একমাসের জন্য ছোটমাসির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কি না। এইরকম নানান জল্পনা-কল্পনায় শান্তনুদের দিন কেটেছে। কিন্তু কয়েকদিন কেটে

BanglaBook.org

যাওয়ার পরই ওদের সব ভাবনা থিতিয়ে গেছে। পলাশ সান্যালকে মনে হয়েছে অন্য কোনও গ্রহের মানুষ। আর অমল রায় ও বিজয় মিত্র যেন শান্তনুদের নয়, অন্য কারও ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।

পলাশ যেদিন এল সেদিনটা ছিল শনিবার। অন্য আর-পাঁচটা দিনের মতোই দিনটা শুরু হয়েছিল।

গুটের সেদিন স্কুল ছুটি ছিল। কিন্তু সোমবারে ক্লাস টেস্ট আছে বলে ওকে দ্বৈপায়নের সঙ্গে ভোরবেলা সীমা বেরোতে দেয়নি। তা ছাড়া আগের দিন বাংলা আর অঙ্ক পরীক্ষা ভালো হয়নি বলে সীমার মেজাজটাও খারাপ ছিল।

দ্বৈপায়ন জিমে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় একবার হাতঘড়ি দেখল। সওয়া দশটা বাজে। সীমাদের ফ্ল্যাট থেকে গুটের হুল্লোড়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কী ভেবে দ্বৈপায়ন সীমাদের ফ্ল্যাটে নক করল।

একটু পরেই সীমার গলা শোনা গেল ঃ 'কে?'

মজা করার জন্য দ্বৈপায়ন গলার স্বর সামান্য বদলে নিয়ে বলল, 'আমি...পলাশ...।'

সঙ্গে-সঙ্গেই ও খেয়াল করল, দরজার ওপাশে 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রেখেছে সীমা। তারপরই দরজা খুলে 'এরকম সাঙ্ঘাতিক ঠাট্টা করার কোনও মানে হয়! এসো—' বলে দ্বৈপায়নকে ঘরে ডেকেছে।

ঘুরে ঢুকেই দ্বৈপায়ন গুটেকে দেখতে পেল।

একটা টেবিলক্লথ পিঠের দিকে ঝুলিয়ে গলায় বেঁধে নিয়েছে। কোমরে একটা বেলট। বুকের কাছে ঝুলছে 'শক্তিমান'-এর একটা পোস্টার। হাতে লম্বা একটা স্কেল।

এই অদ্ভুত সাজসজ্জাসমেত বাচ্চাটা চেয়ার থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে সোফায়, সোফা থেকে মেঝেতে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। আর একইসঙ্গে 'আমি শক্তিমান! আমি শক্তিমান!' বলে চেঁচাচ্ছে।

'মিমো, তোমাকে তখন থেকে কিন্তু বলছি এবার থামো। ওসব জঞ্জাল রেখে পড়তে বোসো।'

দ্বৈপায়ন বুঝল সীমা ছেলের ওপর বেশ রেগে গেছে। ওকে ঠাণ্ডা করার জন্য দ্বৈপায়ন হেসে বলল, 'খেলছে একটু খেলুক না—।'

'তার মানে!' ভ্রূকুটি করে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল সীমা ঃ 'তুমি জানো, আগের দুটো টেস্টে—বেঙ্গলি আর ম্যাথ্‌স-এ ও কী করেছে!'

BanglaBook.org

দ্বৈপায়ন দু-হাত নেড়ে হেসে বলল, 'কী আর করবে! বড়জোর একটু কম নম্বর পেয়েছে, এই তো!'

'সে হলে তো হতই! অঙ্ক পরীক্ষায় দিয়েছিল A-র মালিক আয় বারোশো টাকা, B-র মাসিক আয় তেইশশো টাকা...এইসব দিয়ে একটা সোজা অঙ্ক দিয়েছিল। তো তোমার গুটে সে-অঙ্ক ছেড়ে দিয়েছে। জিগ্যেস করলাম, এই সোজা অঙ্কটা করলি না কেন। তাতে ও কী জবাব দিল জানো? বলল, ইংরেজি অঙ্ক আমি শিখেছি নাকি! ওই যে, ক-খ-গ-র বদলে A-B-C দিয়েছে!'

দ্বৈপায়ন তো গুটের কীর্তি শুনে হেসেই অস্থির।

সীমা গুটেকে আবার ধমকে উঠল, 'মিমো, ওসব রেখে শিগগির পড়তে বোস কিন্তু! নইলে আমি কিন্তু...।'

'আঃ, বউদি কী হচ্ছে!' সীমাকে থামাল দ্বৈপায়ন। তারপর গুটেকে কাছে ডাকল ঃ 'অ্যাই, এদিকে আয়—।'

গুটে 'শক্তিমান!' বলে এক তীব্র হাঁক ছেড়ে লাফ দিয়ে দ্বৈপায়নের কাছে এসে হাজির হল। ওকে দেখে মনেই হল না, মায়ের কথাগুলো ওর বিন্দুমাত্রও কানে ঢুকেছে। সীমা রেগে গিয়ে ওর কান মুলে দিল।

গুটে অসন্তুষ্ট হয়ে সীমার দিকে তাকাল, গজগজ করে বলল, 'সবসময় খালি আমাকে মারবে।'

ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। দ্বৈপায়নের সামনে কান মুলে দেওয়ায় ব্যাপারটা ওর যথেষ্ট প্রেস্টিজে লেগেছে।

সীমা রাগী চোখে ছেলের দিকে একবার তাকাল। তারপর দ্বৈপায়নকে বলল, 'এবারে ওর বাংলা পরীক্ষার কীর্তি শোনো—।'

এ-কথা বলামাত্রই গুটে সীমাকে একেবারে জাপটে ধরল। ওই অবস্থায় প্রায় লাফাতে-লাফাতে বলল, 'না, না—দিপুদাকে কিছুতেই বলবে না। কিছুতেই না। আমি রোজ মন দিয়ে পড়ব।'

কিন্তু সীমাও তখন বেশ রেগে গেছে। ও গুটেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'শোনো, বাংলায় ও কী করেছে। কোয়েশ্চেন দিয়েছিল, তোমার যে সবচেয়ে প্রিয় তার সম্পর্কে দশ লাইন লেখো। তাতে ও কী লিখে এসেছে জানো! লিখেছে ঃ "আমার সবচেয়ে প্রিয় গরু...", তারপর গরু রচনা থেকে দশ লাইন মুখস্থ লিখে দিয়েছে—ওটা তৈরি ছিল, তাই।'

দ্বৈপায়ন হাসতে-হাসতে পেট চেপে ধরে একটা সোফায় বসে পড়ল। আর গুটে 'দিপুদাকে বললে কেন? দিপুদাকে বললে কেন?' বলতে-বলতে ভ্যাঁ

BanglaBook.org

করে কেঁদে ফেলল। মায়ের কাছে গিয়ে ছোট্ট হাতে বারকয়েক কিল মারার চেষ্টা করল। তারপর একছুটে চলে গেল শোওয়ার ঘরের দিকে।

দ্বৈপায়ন ওকে অনেকবার ডাকল, কিন্তু ও শুনল না।

গুটের কাণ্ড শুনে দ্বৈপায়ন অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তারপর সীমাকে বলল, 'বউদি, গুটেকে মারধোর কোরো না, বুঝিয়ে বলো, ঠিক বুঝবে।'

'আর বুঝেছে! শক্তিমানের ছবিটা ওর প্রাণ। দিন-রাত ওটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ওপর তোমার রোলার স্কেট্‌স তো আছেই।'

গুটেকে দ্বৈপায়ন খুব ভালোবাসে। প্রথম পরিচয়ের পর বাচ্চা ছেলেটা ওকে 'কাকু' বলে ডাকত। দ্বৈপায়ন তখন ওকে বারণ করেছিল। বলেছিল 'দিপুদা' বলে ডাকতে। 'কাকু' ডাকটা ওর কেমন যেন কানে লাগত। দ্বৈপায়নের 'বউদি' ডাকটাও কি সীমন্তিনীর কানে লাগে?

দ্বৈপায়ন ওদের তিনজনের কথাই ভাবছিল। মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই কী অদ্ভুতভাবে ও ওদের আপনজন হয়ে উঠেছে। তেমনি ওরাও। ওদের গায়ে কোনও আঁচড় পড়লে দ্বৈপায়ন সেই জ্বালা টের পায়। ওদের সংসারে মেঘ ঘনিয়ে এলে দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরে বৃষ্টি হয়। এ কোন অলৌকিক সম্পর্ক কে জানে!

'ঠিক আছে, রোলার স্কেট্‌স ক'দিন না হয় বন্ধ রাখব।' সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল ও ঃ 'দেখি, গুটেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পড়তে বসাই। বাচ্চাদের সবসময় এরকম মারধোর করলে হয়!'

দ্বৈপায়ন ভেতরের দিকে রওনা হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। সীমা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরল। পলাশের ভয় এ ক'দিনে থিতিয়ে এলেও রিসিভার তোলার সময় সীমার হাত কেঁপে গেল।

'হ্যাঁলো—।'

'মিসেস সেনগুপ্ত বলছেন?' ও-প্রান্ত থেকে ভারি গলায় কেউ বলল।

'হ্যাঁ...আপনি?'

'বিজয় মিত্র, লালবাজার।'

সীমার বুক ঠেলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ও আগ্রহ নিয়ে জিগ্যেস করল, 'বলুন, কোনও খবর আছে?'

সীমা ভাবছিল, পলাশ সান্যাল হয়তো এর মধ্যেই পুলিশে ধরা পড়ে গেছে।

ও-প্রান্তে বিজয় মিত্র হাসলেন ঃ 'এদিকে নতুন কোনও খবর নেই। তাই আপনার কাছে খবর চাইছি।'

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সীমা কেমন স্তিমিত হয়ে গেল ঃ 'নাঃ, এর মধ্যে আর ফোন করেনি।'

দ্বৈপায়ন গুটেকে নিয়ে কখন যেন বসবার ঘরে চলে এসেছে। বাচ্চাটা শক্তিমানের ধড়াচূড়া সব ছেড়ে এলেও কার্ডবোর্ডে সাঁটা ছবিটা এখনও গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

'মিসেস সেনগুপ্ত, পলাশ সান্যালের স্কেচটা কাল সন্ধেবেলা আপনাদের দেখাতে নিয়ে যাব। আর্টিস্টও সঙ্গে যাবে। আপনারা থাকবেন কিন্তু।'

'থাকব।' ছোট্ট করে বলল সীমা।

'আমার দেওয়া ফোন নাম্বার দুটো মনে আছে তো?'

সীমা জানাল, হ্যাঁ, আছে।

'কোনওরকম ইমারজেন্সি হলেই আমাকে রিং করবেন।' বিজয় মিত্র ফোন রেখে দিলেন।

সীমা রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকাল। ওর চিন্তা পলাশ সান্যালকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করল।

দ্বৈপায়ন জিগ্যেস করল, 'কে ফোন করেছিল, বউদি?'

সীমা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'সেই পুলিশ অফিসার—বিজয় মিত্র।'

'কী ব্যাপার বলো তো? কী ভাবছ?'

সীমা অসহায়ভাবে বলল, 'পলাশ সান্যাল যদি কখনও হঠাৎ করে চলে আসে তখন তুমি যদি কাছে না থাকো, তা হলে তোমাকে জানাব কেমন করে? তোমার দাদা যা ছাপোষা মানুষ! ওরকম ডেঞ্জারাস একজন মার্ডারারের সঙ্গে পেরে উঠবে না।'

'কে মার্ডারার, মা?' গুটে কৌতূহলে জানতে চাইল।

সীমা ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'চুপ কর। সব ব্যাপারে ফোড়ন কাটা চাই!'

'আহা, ওকে বকছ কেন!' বলে দ্বৈপায়ন গুটের মাথার ছোট-ছোট চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'এসব বড়দের ব্যাপার, তুই বুঝবি না।' তারপর সীমার দিকে ফিরে ঃ 'বউদি, তোমাকে তো আগেও বলেছি, আমাকে ঘরে নয় অফিসে একটা ফোন করে দেবে। আর আমি তো মাঝে-মধ্যে ফোন করে তোমাদের খবর নিই। এত ভয় পেলে কখনও চলে? তুমি বরং বিজয়বাবুর দেওয়া ফোন নাম্বার দুটো আমাকে দাও—আমি লিখে নিই।'

সীমা তাড়াতাড়ি ফোন নম্বর দুটো খুঁজে বের করে একটা চিরকুটে টুকে দ্বৈপায়নকে দিল।

ওটা পকেটে রেখে দ্বৈপায়ন বলল, 'শান্তনুদার সঙ্গে স্কুলের আর কোনও বন্ধুর কোনও কনট্যাক্ট নেই?'

BanglaBook.org

সীমা বলল, 'সুজিত আর পার্থ নামে দুজনের সঙ্গে আছে। ওদের অনেকদিন আগেই ও জিগ্যেস করেছিল। পলাশ সান্যাল নামটাই ওরা মনে করতে পারছে না।'

দ্বৈপায়ন ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তুমি ভয় পেয়ো না। কেউ দরজায় নক করলে বা বেল টিপলে আগে "ম্যাজিক আই" দিয়ে দেখে নেবে। তবে পলাশ সান্যাল এলে তাকে যেন আবার দরজা থেকে বিদেয় করে দিয়ো না। লোকটা অ্যারেস্ট হওয়া দরকার। নয়তো আরও অনেকের সর্বনাশ করবে। তোমাকে একটিই রিকোয়েস্ট, কিছুতেই যেন নার্ভ ফেল কোরো না।'

চলে যাওয়ার আগে দ্বৈপায়ন গুটের মাথায় একটা চাঁটি মেরে গেল। আর সীমাকে বলে গেল, 'তোমার ভয় কীসের, বউদি! আমি তো আছি।'

এর ঠিক আট ঘণ্টা পরে, সন্ধে সাতটা নাগাদ, পলাশ সান্যাল যখন এল তখন দ্বৈপায়নের শেষ কথাগুলো সীমন্তিনীর সবচেয়ে আগে মনে পড়ল।

'ম্যাজিক আই' দিয়ে আগন্তুকের পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। শুধু শক্ত চোয়াল, গলা, আর কাঁধের খানিকটা অংশ চোখে পড়ছে। তামাটে গলায় দুটো কালো ভাঁজ, দু-চারটে কাঁচা-পাকা দাড়ির খোঁচা, সাদা-নীল স্ট্রাইপ দেওয়া কলার, আর হালকা সবুজ সোয়েটার।

দরজা খুলে দেওয়ার মুহূর্তেও সীমন্তিনী ভাবতে পারেনি অতিথি পলাশ সান্যাল হতে পারে। সেই কারণেই দরজা খুলে ভিনগ্রহের মানুষটাকে দেখে ও চমকে উঠল। ওর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল পলকে।

পলাশ অবাক হলেও হেসে বলল, 'কী ব্যাপার! তুমি যে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলে!'

ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ইন্দ্রিয়ের কবলে পড়ে সীমা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিল। ও অসহায়ভাবে দেখল, পলাশ সান্যাল হাসিমুখে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে এল, তারপর দরজা ঠেলে বন্ধ করে দিল। 'ক্লিক' করে নাইটল্যাচ বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ হল।

শান্তনু বসবার ঘরের সোফায় গা এলিয়ে রঙিন টিভির দিকে চোখ মেলে বসে ছিল। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

পলাশকে দেখামাত্রই সিগারেটটা হাত থেকে পড়ে যেতে চাইছিল। ও কোনওরকমে দুর্ঘটনাটা সামলে নিল। একইসঙ্গে সীমন্তিনীর মুখের চেহারা

BanglaBook.org

ওকে ভয় পাইয়ে দিল। ও সহজ গলায় পলাশকে অভ্যর্থনা জানাতে চেষ্টা করল ঃ 'কী ব্যাপার! সেই যে হুট করে একদিন এলি...তারপর তো একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলি। রোজই আমি বাড়ি ফিরে ওকে জিগ্যেস করি পলাশ ফোন করেছিল কি না—।'.

ওর কাছাকাছি একটা সোফায় পলাশকে বসতে ইশারা করল শান্তনু।

পলাশ ছোট্ট একটা শব্দ করে এগিয়ে এল সোফার কাছে। ওর চঞ্চল চোখ চারপাশটা চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছিল। সীমা আর শান্তনুকেও একপলক দেখে নিল ও।

সীমা ওর চোখে সন্দেহের দৃষ্টি খুঁজতে চাইল। গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, 'বসুন। চা খাবেন তো?'

পলাশ অবাক হয়ে সীমার দিকে তাকাল ঃ 'শুধু চা! আমি তো ভাবছিলাম, সাহেবরা যাকে বলে ডিনার একেবারে তা-ই খেয়ে যাব।' কথার শেষে ও হো-হো করে হেসে উঠল।

'সে তো খাবেনই।' হেসে বলল সীমা, 'ডিনার না খাইয়ে আপনাকে আজ ছাড়ছি না।' পলাশকে যে-করে-হোক আটকে রাখতেই হবে।

পলাশ বসতেই শান্তনু ওকে সিগারেট অফার করল। সম্পূর্ণ নতুন চোখে ওর স্কুলের বন্ধুকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। খুঁজে পেতে চাইল একজন ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীকে।

টেবিলে রাখা লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল পলাশ। তারপর লাইটার রেখে সিগারেট-ধরা ঠোঁটে জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, 'কেমন আছিস বল।'

শান্তনুর বুকের ভেতরে এলোপাতাড়ি ঢাক বাজাচ্ছিল কেউ। বরাবর অঙ্কে ওর মাথা ভালো। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওর সব অঙ্ক কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। পলাশের চওড়া কাঁধ আর হাতের পেশির দিকে তাকিয়ে ও স্পষ্ট বুঝল, সমান-সমান লড়াইয়ে পলাশকে কাবু করা ওর কর্ম নয়। দ্বৈপায়ন কাছে থাকলেও বা কিছু একটা ভাবা যেত। ও ডাকাবুকো ছেলে, শক্তি-সামর্থ্যও কম নয়। কিন্তু একা-একা...।

শান্তনু সময় পেলেই গল্প-উপন্যাস পড়ে, কেবল টিভি-তে সিনেমাও দ্যাখে। সেখানে অবিশ্বাস্য কত কিছু ঘটে যায়। মিমোর 'শক্তিমান' হলেও এতক্ষণে বহু কিছু করে ফেলত। হয়তো পলাশকে শূন্যে তুলে ঘুরপাক খাইয়ে ছুড়ে দিত মহাকাশে। 'ডাই হার্ড' ছবির ব্রুস উইলিস কেমন একা লড়াই করে হারিয়ে দিল এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী দলকে। 'ফার্স্ট ব্লাড' ছবিতে সিলভেস্টার স্ট্যালোনও কি কম কিছু করেছিল! কিংবা, আরনল্ড সোয়ার্ৎজেনেগার, স্টিভেন

BanglaBook.org

সিগাল, জাঁ ক্লদ ভ্যান ড্যাম—ওরাও তো কত লড়াই করে সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক সব ভিলেনদের সঙ্গে! সানি দেওল, সঞ্জয় দত্, মিঠুন চক্রবর্তী...একের পর এক নাম মনে পড়ছিল। লোকে বলে বুদ্ধির জোর বেশি। কিন্তু শুধু বুদ্ধির জোরে কি কিছু করা যায়! গায়ের জোরও দরকার।

তখনই সীমার দিকে চোখ পড়ল ওর। আর মনে হল, নাঃ, মনের জোর থাকাটাও এখন বেশ জরুরি।

সীমা চোখে-চোখে কী একটা ইশারা করতে চাইল শান্তনুকে। তারপর চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

সীমা কি বিজয় মিত্রকে ফোন করার জন্য ইশারা করল? কথাটা ভাবতে গিয়েই শান্তনুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ফোন নম্বর দুটো ও মুখস্থ করে রেখেছিল। কিন্তু এখন কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। কেমন যেন সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ফোন করতে গেলেই পলাশ নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। ও যদি বাথরুমে যায় সেই ফাঁকে ফোনটা করে ফেলা যায়। কিন্তু হঠাৎ ও বাথরুমেই বা যাবে কেন? আচ্ছা, ওকে জিগ্যেস করলে কেমন হয়!

'তুই কি বাথরুমে যাবি?' এলোপাতাড়ি ভাবতে-ভাবতে এই হাস্যকর প্রশ্নটা শান্তনুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

পলাশ চোখ ছোট করে শান্তনুর দিকে তাকাল ঃ 'তার মানে! জিগ্যেস করলাম, কেমন আছিস। তার উত্তর হল, তুই কি বাথরুমে যাবি?' একটু থামল পলাশ। তারপর ঃ 'কী ব্যাপার বল তো! তুই কি অন্য কিছু ভাবছিস?'

বেসামাল পরিস্থিতিটা সামলে নেওয়ার জন্য শান্তনু হাতের সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিল। একবার টিভির দিকে দেখল, একবার পলাশের দিকে। সীমন্তিনী চা নিয়ে এসে পড়লে বাঁচা যেত। ও কী যে করছে এতক্ষণ!

জোর করে হাসার চেষ্টা করল শান্তনু। কয়েকবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'আজকাল আমার এইরকম হয়েছে। আনমনাভাবে উলটোপালটা সব কথা বলে ফেলছি। যাকগে, তোর কী খবর বল। চাকরি-বাকরি কেমন চলছে?'

'চাকরি! তোকে তো কখনও বলিনি যে, আমি চাকরি করি।' হেসে বলল পলাশ। তারপর বেশ সিরিয়াস ঢঙে মন্তব্য করল, 'আমি কারও চাকর নই। আমি স্বাধীন।'

শান্তনু উত্তরে কী বলবে ভাবছিল, ঠিক তখনই সীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। পলাশের সামনে টেবিলে কাপ-প্লেট সাজিয়ে দিতে-দিতে শান্তনুকে লক্ষ করে বলল, 'তোমার চা করিনি। তোমাকে একটু বাজারে যেতে হবে। তারপর ফিরে এসে চা খাবে।' পলাশের দিকে তাকিয়ে সীমা বলল, 'পলাশদা, আপনি কিছু

BanglaBook.org

মাইন্ড করবেন না। আপনি গেস্ট—আপনার জন্যে স্পেশাল কিছু রাঁধতে না পারলে আমার মন মানবে না। দশমিনিটেই ও ঘুরে চলে আসবে—আপনি ততক্ষণ টিভি দেখুন।'

শান্তনু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ও সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই সীমা ওকে ভেতরে ডাকল।

সীমার বুকের ভেতরে যাচ্ছেতাই ব্যাপার চলছিল। ও কোনওরকমে শান্তনুকে রান্নাঘরের কাছে ডেকে নিয়ে এল। বাজারের থলে আর টাকা ওর হাতে দিতে-দিতে চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'বাইরে বেরিয়েই দিপুকে একটা খবর দেবে। তারপর বিজয় মিত্রের দেওয়া নাম্বারে ফোন করে সব বলবে। বলবে, ভীষণ বিপদ—।'

শান্তনু যখন বলল, ফোন নম্বর দুটো ওর মনে নেই, তখন সীমা বলল যে, নম্বর দুটো দিপু জানে।

শান্তনু ঘোর-লাগা মানুষের মতো আলগা পায়ে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে হাঁটা দিল। সীমা আর মিমোকে একটা ভয়ঙ্কর খুনির সঙ্গে রেখে যেতে ওর বুক দুরদুর করছিল।

বাসন্তী রান্নাঘরে একমনে মশলা বাটছিল। আর মিমো শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বই-খাতা ছড়িয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল। সীমা শান্তনুকে রওনা করে দিয়েই শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল মিমো নেই। বই-খাতা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রেখে কোন ফাঁকে উঠে পড়েছে।

সীমা তাড়াতাড়ি পা ফেলে বাথরুমের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল মিমো সেখানে নেই। তা হলে নিশ্চয়ই ও বসবার ঘরে পলাশের কাছে গেছে! সীমার বুকের ভেতরে ঢেঁকির পাড় পড়ল যেন। ও 'মিমো! মিমো!' করে ডাকতে-ডাকতে প্রায় ছুটে এল বসবার ঘরে।

বাড়িতে যে কোনও অতিথি এসেছে সেটা মিমো পড়তে-পড়তেই টের পেয়েছিল। তাই পড়ার ব্যাপারটা মোটামুটি শেষ হতেই ও চুপিসারে চলে এসেছে বসবার ঘরে।

টিভিতে তখন খবর পড়া হচ্ছিল। চা-সিগারেট খেতে-খেতে পলাশ একমনে টিভি দেখছিল। গলায় 'শক্তিমানের' ছবি ঝোলানো বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়েই পলাশ আদর করে ওকে কাছে ডেকেছে, 'কী খবর, অচ্যুতবাবু, কেমন আছ?'

শান্তনু তখন পলাশকে 'আসছি' বলে ফ্ল্যাটের ল্যাচে হাত রেখেছে। সুতরাং মিমো যখন কথা বলল তখন শান্তনু আর সীমা দুজনেই পলাশের কাছ

BanglaBook.org

থেকে মাত্র হাত পাঁচ-ছয় দূরে দাঁড়িয়ে। ওরা তিনজনে যেন একটা বিষমবাহু ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু তৈরি করেছে।

ওদের তিনজনকেই স্তম্ভিত করে দিয়ে মিমো পলাশকে জিগ্যেস করল, 'পলাশকাকু তুমি মা-মার্ডারার? সেদিন মা দিপুদাকে বলছিল...।'

মিমোর কথায় জগৎ-সংসার পলকে স্থবির হয়ে গেল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, কোনও চেতনা নেই। শুধু তিনটে রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ পরস্পরকে বিমূঢ় চোখে দেখছে।

শান্তনুর কণ্ঠা ওঠা-নামা করছিল বারবার। যেন সাঁতার না-জানা কোনও ডুবন্ত মানুষ অসহায়ভাবে খাবি খাচ্ছে। ওর রোগা চেহারায় যেটুকু বা বুদ্ধিদীপ্ত ভাব ছিল এখন সেটা সম্পূর্ণ উবে গেছে। ও বড়-বড় চোখে পলাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর চোখের কোণ দিয়ে টের পাচ্ছিল সীমন্তিনীর দুর্দশা। এই মুহূর্তে কে বলবে ও সুন্দরী! কপালে ভাঁজ, চোখে-মুখে ভয়, বুক পাথর। যেন কোনও আগ্নেয়গিরির প্রলয় শুরু হওয়ার জন্য একরাশ আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

পলাশের স্নায়ুতন্ত্রীর প্রশংসা করতেই হয়। ও সিগারেট নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে রেখে দিল। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর মিমোর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে শান্তনুকে লক্ষ করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোরা তা হলে সবই জেনে গেছিস!'

শান্তনু শুকনো ঢোঁক গিলে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর কেমন একটা জড়ানো স্বরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ...পুলিশ সব জানে...।'

পলাশ ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর আপনমনেই বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, 'আমি যে এখানে সাতটার সময়ে আসব তা তো তোরা জানতি না! তা হলে পুলিশ এখনও খবর পায়নি যে, আমি এখানে আছি...।'

সীমা অনেক চেষ্টা করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনার বাঁচার আর কোনও পথ নেই, পলাশদা...। পুলিশের লোকজন সাদা-পোশাকে আমাদের ফ্ল্যাটের ওপরে নজর রাখছিল। তারা আপনাকে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লালবাজারে খবর চলে গেছে।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সীমা ঃ 'আপনার আর কোনও আশা নেই...।'

মিথ্যে কথাগুলো সত্যির মতো গোমাল তো! গলার স্বর খুব বেশি কেঁপে যায়নি তো! ভাবল সীমা।

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ...।' খুব স্বাভাবিক গলায় বলল পলাশ।

BanglaBook.org

ওর মোটা-মোটা গাঁটওয়ালা আঙুলগুলো মিমোর মাথায়, গালে, গলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সীমার বুকের ভেতরে উথালপাথাল চলছিল, একটা ভয়ঙ্কর কান্না গলা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। পলাশ মিমোকে ছুঁয়ে আছে দেখেই ওর ভীষণ ভয় করছিল। অমল রায়, বিজয় মিত্র, ওঁদের সন্দেহের প্রতিটি কণা তা হলে সত্যি!

'মিমো, আমার কাছে আয়—।' ছেলেকে ডাকল সীমন্তিনী। আর একইসঙ্গে পা বাড়াল ছেলের দিকে, পলাশের দিকে।

সরল, নিষ্পাপ, দুরন্ত ছেলেটা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা ভোঁতা হয়ে গেছে পলকে। ওর মুখে কোনও কথা সরছে না। শুধু অবাক হয়ে বাবার ছোটবেলার বন্ধুকে দেখছে।

মায়ের ডাকে মিমো সাড় ফিরে পেল যেন। ও কচি গলায় ডেকে উঠল, 'মা!'

ওর ডাকে খানিকটা কান্না মিশে গেল।

পলাশের চঞ্চল চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ও মনে-মনে কিছু একটা হিসেব কষছে।

সীমন্তিনী ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ও এক ঝটকায় মিমোকে ঠেলে দিল একটা সোফার দিকে। মিমো সোফায় ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সীমন্তিনী একটা চাপা চিৎকার করে উঠতেই পলাশ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। কখন যেন ও ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়েছিল। এখন সেটা বাইরে বেরিয়ে আসতেই ছোট মাপের একটা ধারালো চাকু ঝলসে উঠল ওর হাতে।

অদ্ভুত তৎপরতায় পলাশের ভারি শরীর পৌঁছে গেল মিমোর কাছে। সামান্য ঝুঁকে পড়ে এক হ্যাঁচকায় বাচ্চাটাকে টেনে তুলল। ছোট বাঁকানো ফলার ছুরিটা ওর কানের পিছনে চেপে ধরে শান্তনুকে লক্ষ করে চাপা হিংস্র গলায় বলল, 'দরজায় ছিটকিনি-খিল সব এঁটে দে! এক্ষুনি!'

শান্তনু আতঙ্কের চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কাঁপা হাতে কোনওরকমে ও পলাশের হুকুম তামিল করল।

'এখানে আমার কাছে এসে বোস।' শান্তনুকে আবার আদেশ করল পলাশ।

নিশি-পাওয়া মানুষের মতো শান্তনু পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল পলাশের কাছে। একটা সোফায় বসে পড়ল।

BanglaBook.org

মিমো কাঁদছিল। কিন্তু শান্তনু যেন অচেনা কোনও মানুষের মতো ছেলেকে দেখছিল। ওর মনে হচ্ছিল, এগুলো ওর জীবনের ঘটনা নয়। ও ভ্যান ড্যাম অথবা ব্রুস উইলিসের কোনও অ্যাকশন ছবি দেখছে। ওসব সিনেমায় যা হয়, বাস্তবে তা হতে পারে বলে শান্তনুর মন কখনও বিশ্বাস করেনি।

মিমোকে কাঁদতে দেখে সীমন্তিনী নিজেকে আর শক্ত করে ধরে রাখতে পারেনি। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। জল ভরা চোখেই ও দেখছিল, মিমোর বুকে শক্তিমানের ছবিটা নিছকই ছবি হয়ে ঝুলছে।

'মিমোকে ছেড়ে দিন, পলাশদা!' কান্না-ভাঙা কাতর গলায় পলাশের কাছে যেন ভিক্ষে চাইল সীমা। ওর মন দ্বৈপায়নকে ডাকতে লাগল আকুল হয়ে।

পলাশ দাঁত বের করে হাসল। ওর দাঁতের জোড়গুলোয় কালচে ছোপ চোখে পড়ল। হাত নেড়ে ইশারা করে সীমাকে কাছে ডাকল পলাশ, 'তুমিও লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখানটায় চলে এসো। শান্তনুর কাছে চুপটি করে বসে পড়ো।'

সীমা প্রায় ছুটে এসে বসে পড়ল শান্তনুর পাশে।

এমন সময় টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

শান্তনু নিশ্চল হয়ে বসেছিল। ওর বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। ও পলাশের নজর এড়িয়ে সীমাকে ছোট্ট করে ঠেলা দিল। অর্থাৎ, জলদি টেলিফোনটা ধরো।

কিন্তু টেলিফোন ওঁদের কাউকেই ধরতে হল না। কারণ, মিমোকে সঙ্গে নিয়ে পলাশ টেলিফোনের কাছে গেল। রিসিভার তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলল।

'মিস্টার সেনগুপ্ত আছেন?' ও-প্রান্তে কেউ একজন জিগ্যেস করল।

পলাশ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল, 'রং নাম্বার।'

তারপর মন্তব্য করল, 'টেলিফোন যন্ত্রটাই বড় বিরক্তিকর—।' এবং টেলিফোনের তারটা দেওয়ালের জাংশান বক্স থেকে একটানে ছিঁড়ে দিল।

সীমন্তিনীর মনে আশার যে-সরু সুতোটা দোলাচলে দুলছিল সেটাও যেন কেউ একটানে ছিঁড়ে নিল।

বাসন্তী যে কখন ড্রইং স্পেসের সামনে করিডরে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা কেউই টের পায়নি। টেলিফোনের তারটা ছিঁড়ে নেওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পলাশ ওকে দেখতে পেল। ওর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে হিংস্রভাবে পলাশ বলল, 'ভেতরে গিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ কর। চেঁচামেচি করলে প্রথমে মিমোর গলা কাটব, তারপর তোর।' হাত তুলে ঝকঝকে ফলার ছুরিটা দেখাল পলাশ।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বাসন্তী প্রায় ছুটে চলে গেল ভেতরের দিকে।

BanglaBook.org

মিমো চোখে হাত ঘষে কাঁদছিল। পলাশ ওর কাছে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর বলছি!'

মিমো চমকে উঠে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

পলাশ নিজের কপালের দু-পাশটা বাঁ হাতে জোরে টিপে ধরল। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। তারপর ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আ—আঃ!'

একইসঙ্গে বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল মিমোর গালে ঃ 'চুপ কর বলছি! চিৎকার করে পাগল করে দেবে দেখছি!'

ওইটুকু বাচ্চার গালে কেউ যে অমনভাবে চড় কষাতে পারে এটা শান্তনু বা সীমন্তিনী কল্পনাও করতে পারেনি। ওরা দুজনেই ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। মিমো আরও জোরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু এরপরই পলাশ যা করল তাতে ওইটুকু বাচ্চাও চুপ করে যেতে বাধ্য হল।

মিমোর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল পলাশ। ছুরি ধরা ডান হাতটা ওর গলার নলির কাছে নাচাতে-নাচাতে চিবিয়ে-চিবিয়ে হাসল, তারপর বলল, 'একটানে নলিটা দু-ফাঁক করে তোর কান্না থামিয়ে দেব, অ্যাঁ!' পাগলের মতো হেসে উঠল পলাশ ঃ 'তখন তোর সব কান্না গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে—মুখ দিয়ে আর বেরোবে না। দেখবি? কী রে, দেখবি, অ্যাঁ?'

শান্তনু আর সীমন্তিনী ভয়ঙ্কর একটা খুন-পাগল মানুষকে দেখতে পেল যেন। সীমন্তিনী আর সইতে পারল না। সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে ছুটে গেল ছেলের কাছে। আর ঠিক তখনই পলাশ মিমোকে এক ধাক্কায় মায়ের দিকে ঠেলে দিল, বলল, 'ছেলেকে যে-করে-হোক চুপ করাও!'

মিমো চুপ করে গিয়েছিল তার আগেই। ওর মুখ ভয়ে নীল। সীমা ছেলেকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। কোণঠাসা ইঁদুর যেভাবে হন্যে হয়ে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায় সেইভাবে বাঁচার একটা পথ খুঁজে বেড়াতে লাগল সীমা। মিমোকে টেনে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

পলাশ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বড়-বড় শ্বাস ফেলছে।

হঠাৎই মিমোর গলায় ঝোলানো শক্তিমানের ছবিটার দিকে নজর গেল সীমার। ছবিটা যে ওর ছেলের প্রাণ সে-কথা দ্বৈপায়ন ভালো করেই জানে। যদি...।

সীমা আর সময় নষ্ট করল না।

'আবার তুমি এই ছবিটা গলায় ঝুলিয়েছ!' শান্তনু আর পলাশকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে বেচারি মিমোকে ধমক দিল সীমা। শক্তিমানের ছবিটা ধরে এক টান মারল ও।

BanglaBook.org

সুতো ছিঁড়ে ছবিটা চলে এল সীমার হাতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও সেটা ছুড়ে দিল খোলা জানলা লক্ষ করে। গজগজ করে মন্তব্য করল, 'হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও তুমি ওইসব আজেবাজে ছবি গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে! লেখাপড়া ছেড়ে যত্তসব বাজে কাজ!'

সীমার আচমকা এই আচরণে পলাশ ও শান্তনু দুজনেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। পলাশ চোখ ছোট করে তাকাল সীমার দিকে। যেন সীমার আচরণের সারমর্মটুকু ও নিখুঁতভাবে মেপে নিতে চায়। কিন্তু রহস্যের কোনও উত্তর খুঁজে পেল না পলাশ। ও টের পেল না যে, সীমা তখন আকুলভাবে প্রার্থনা করছে, দ্বৈপায়ন যেন যে-কোনওভাবে রাস্তায় অবহেলায় পড়ে থাকা শক্তিমানের ছবিটা দেখতে পায়। ঠাকুর, দিপু যেন ছবিটা দেখতে পায়!

পলাশ জানলার কাছে গিয়ে দেওয়ালের আড়াল থেকে খুব সাবধানে উঁকি মারল নীচের রাস্তায়। সত্যিই কি সাদা-পোশাকের গোয়েন্দারা ওত পেতে আছে অন্ধকারে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে! এই ফ্ল্যাটে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? সীমার কথা কতটুকু সত্যি?

জানলা থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নজর চালিয়েও কাউকে দেখতে পেল না পলাশ।

তখন ও ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগিয়ে এল সীমা আর মিমোর কাছে। অদ্ভুতভাবে হেসে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

'সীমাসুন্দরী, পুলিশকে ঠিক কতটুকু বলেছ? কী-কী জানতে চেয়েছে পুলিশ? কবে এসেছিল ওরা?'

সাপ যদি কথা বলতে পারত তা হলে বোধহয় এই সুরেই কথা বলত।

একটা ভয়ঙ্কর মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখছিল সীমন্তিনী। এই লোকটার হাতে ধর্ষিত হয়ে খুন হওয়ার সময় মেয়েগুলোর জঘন্য আতঙ্ক ও স্পষ্ট টের পেল। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। মিমো উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে দিল মায়ের কোলে।

শান্তনু এবার সীমার জন্য ভয় পেল। স্থবির অবস্থা কাটিয়ে ও মুখ খুলল, 'তোকে...তোকে দেওয়া...টেলিফোন নাম্বার লেখা চিরকুটটা নিয়ে...পুলিশ আমাদের কাছে এসেছিল...।'

পলাশ আনমনা হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'তা হলে বাইপাসের ওই মেয়েটার কাছে কোথাও চিরকুটটা আমি হারিয়েছি...।' শান্তনুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে ও জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

একে-একে সব বলে গেল ওরা। কখনও শান্তনু, কখনও সীমন্তিনী।

BanglaBook.org

ইতস্তত করে, হোঁচট খেয়ে ওরা অমল রায় আর বিজয় মিত্রের সব কথা বলে গেল। সীমা ইচ্ছে করেই দ্বৈপায়নের কথা বলেনি। সীমার কথার ধরন দেখেই শান্তনু ইশারাটা বুঝে নিয়েছিল। তাই ও-ও দ্বৈপায়নের কথা এড়িয়ে গেল।

কিন্তু তাতে পুরোপুরি পাশ কাটানো গেল না। ওদের কথা শেষ হতেই পলাশ সীমাকে লক্ষ করে প্রশ্ন করল, 'দিপুদা কে? তোমার ছেলে বলছিল...।'

'আমার পিসতুতো দিদির ছেলে। বালিগঞ্জে থাকে।' নির্বিকারভাবে উত্তর দিল সীমা।

পলাশ এবার আপনমনে হেসে উঠল। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। টিভি-তে কোনও একটা বিজ্ঞাপনের চড়া মিউজিক বাজছিল। বিরক্ত হয়ে সেদিকে তাকাল পলাশ। বাঁ হাতে কপাল টিপে ধরল। তারপর ছুরিটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে টেবিল থেকে একটা কাপ তুলে নিল। সবাইকে চমকে দিয়ে চাপা গলায় খিস্তি করে টিভি-র পরদা টিপ করে কাপটা গায়ের জোরে ছুড়ে মারল।

বিচিত্র শব্দ করে টিভি-র পরদা চুরমার হয়ে গেল। আগুনের ফুলকি দেখা গেল। ধোঁয়া বেরোল টিভি-র ভেতর থেকে। কাপটা নিরীহ বেড়ালছানার মতো অটুট অবস্থায় টিভি-র খোলের ভেতরে বসে রইল।

পলাশ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা "লা পলাশ" কাপের বিজ্ঞাপন।' তারপর রেডিয়োর বিজ্ঞাপনের মতো সুর করে উচ্চারণ করল, 'টুং-টুং।'

ওদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল পলাশ। হাতে হাত ঘষে শান্তনুকে বলল, 'এবার আমার কথা বলি, শোন। তুই তো জানিস, স্কুলে আমি ভীষণ কম-কম নম্বর পেতাম। মাস্টারগুলো এত বজ্জাত ছিল যে, কিছুতেই আমাকে নম্বর দিতে চাইত না। স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি একদিন রাতে ঢিল ছুড়ে নগেনবাবুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।'

শান্তনুর নগেনবাবুকে মনে পড়ল। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা। ওদের অঙ্কের স্যার ছিলেন। খুব কড়া ধাতের নীতিবাগীশ শিক্ষক ছিলেন। কোনও ছাত্রকেই অন্যায্য নম্বর দিতেন না।

পলাশ চায়ের টেবিলটাকে ঘিরে অলসভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলতে লাগল, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানিস, কেউ কখনও আমাকে ভালো চোখে দ্যাখেনি। যেমন ধর, তোরা। ছোটবেলা থেকেই আমার কপাল পোড়া। বাবা দিনরাত্তির আমাকে হুকুম করত। আর সেসব কাজ করতে গিয়ে পান থেকে চুন খসলেই আমাকে ধরে বেধড়ক ঠ্যাঙাত। মা চেঁচাত বটে, কিন্তু বাবা মাকে একেবারেই পাত্তা দিত

BanglaBook.org

না। সবসময় আমাকে চাকর-বাকরের মতো ট্রিট করত। বলত, তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। তোকে কেউ কোনওদিনই পাত্তা দেবে না...।'

সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে হাসল পলাশ, গুনগুন করে আবৃত্তি করল ঃ

'ছন্নছাড়া ছিন্ন-ছেঁড়া গাছ পাথরের জীবন—
এই জীবনের পোশাকী নাম মরণ, শুধু মরণ।'

তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে তেতো হাসি হেসে হতাশার একটা শব্দ করল ঃ 'হাঃ! সেই কোন ছোটবেলা থেকে নিজের লাশটা কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ আমাকে আমল দেয় না...অথচ আমি আমল পেতে চাই।

'জানিস, শান্তনু, কলেজেও সেই একই কেস হল। কো-এড কলেজে ভরতি হয়েছিলাম। ভেতরে-ভেতরে মেয়েদের জন্যে দারুণ একটা লোভ ছিল। আজেবাজে স্বপ্ন দেখতাম, রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে যা-তা ভাবতাম, যা খুশি করতাম। কিন্তু দিনের আলোয় সাহস করে মেয়েবন্ধুদের কিছু বলতে পারতাম না। বহুদিন ধরে মনে-মনে রিহার্সাল দেওয়ার পর রুমকি আর লোপামুদ্রাকে মনের গোপন ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম। ওরা অবাক হয়ে হি-হি করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, "পলাশ, তুই না মাইরি একটা ভোঁদাই-কিতকিত! তোর বোধহয় মাথা-ফাথার ঠিক নেই। হি-হি হি-হি...।" চকিতে ঝুঁকে পড়ে টেবিলে জোরালো একটা চাপড় কষাল পলাশ ঃ 'ব্যস, সব গল্প শেষ। লোপামুদ্রা আর রুমকি অনেকের সঙ্গেই ইয়ে করত, অথচ শুধু আমার বেলায় বাদ!

'ধীরে-ধীরে আমি নিজেকে বদলাতে শুরু করলাম। বুঝলাম, অধিকার চাইলেই পাওয়া যায় না—ছিনিয়ে নিতে হয়। তাই ভেতরে-ভেতরে তৈরি হতে লাগলাম। কিন্তু একইসঙ্গে আমার একটা অসুখ দেখা দিল। মাঝে-মাঝেই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। একটা অদ্ভুত দপদপানি। সেই সময়ে আমি কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ি, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। লাস্ট এক বছরে অসুখটা ডেঞ্জারাস চেহারা নিল। তারপর...এই মাস ছ'সাত আগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একটা মেয়েকে শাস্তি দিলাম...আমাকে পাত্তা না দেওয়ার শাস্তি। মেয়েটা খুব ছোট ছিল...' কথা বলতে-বলতে সীমন্তিনীর কাছে এগিয়ে এল পলাশ। হঠাৎই ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, 'তোমার চেয়েও অনেক ছোট।'

সীমা এক ঝটকায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

পলাশ বাঁকানো ছুরিটা সীমার চোয়ালের নীচে ঠেকাল। দাঁতে দাঁত চেপে

BanglaBook.org

বলল, 'তবে মেয়েটার জিনিসপত্তর ছিল তোমার মতোই। ডান হাতে সীমার মুখটা একরকম জোর করেই নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল পলাশ ঃ 'তুমি যেন আবার ভুল করে আমাকে পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা কোরো না।' শান্তনুর দিকে তাকিয়ে ঃ 'শান্তনু, তোর ওয়াইফকে সাবধান করে দে। বেচারি এখনও আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।'

সীমন্তিনীর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় অনুনয় করল শান্তনু।

পলাশ বলে চলল, 'ব্রিগেডের পর কসবা, তারপর বাইপাস, তারপর...।'

সীমন্তিনীর চিবুকে আলতো করে টোকা মারল পলাশ ঃ 'তারপর কি সল্টলেক?'

সীমার চিবুকে অসংখ্য মাকড়সা হেঁটে বেড়াতে লাগল। ও আবার দিপুর জন্য আকুল প্রার্থনা করল।

পলাশ দু-হাত ঝাঁকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে ও কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল ঃ 'টুং-টাং...।'

পলাশ পলকে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

আর সীমন্তিনী এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল।

ওর এইরকম আচমকা উঠে দাঁড়ানোয় মিমো ধাক্কা খেয়ে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। শব্দ করে সামান্য কেঁদে উঠে মাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে চাইল।

ততক্ষণে কলিংবেল আবার বেজে উঠেছে ঃ 'টুং-টাং।'

'কে এসেছে? পুলিশ?' সন্ত্রস্তভাবে জানতে চাইল পলাশ। ওর গলার স্বর কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে চেরা-চেরা শোনাল।

শান্তনু জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল সীমন্তিনীর দিকে। সীমা তখন মরিয়া হয়ে ভাবছে, কে আসতে পারে এই অসময়ে? কে এই দেবদূত? পুলিশ? নাকি অন্য কেউ?

হয়তো বিজয় মিত্র অথবা অমল রায় ফোনে যোগাযোগ করতে চেয়ে পারেননি। তখন নিছকই সন্দেহের বশে চলে এসেছেন শান্তনুদের ফ্ল্যাটে। হয়তো...।

দরজা খোলার জন্য সামনে পা বাড়াল সীমা। সঙ্গে-সঙ্গে পলাশ ওকে চাপা গলায় ধমক দিল, 'দরজা খুলবে না।'

সীমা বিরক্ত হয়ে তাকাল পলাশের দিকে। পলাশের মুখটা কোণঠাসা বাঘের মতো দেখাচ্ছে। এই শীতেও কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটেছে।

'দরজা না খুললে সন্দেহ হবে। আপনার বিপদ আরও বাড়বে...।' ঠাণ্ডা

BanglaBook.org

গলায় বলল সীমা। ও বেশ বুঝতে পারছিল পালটা ভয় না দেখালে পলাশের মতো পাগল খুনিকে রোখা যাবে না। দরজায় যে-ই এসে থাকুক, তাকে পলাশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তা নইলে...।

আবার কলিং বেল বাজল।

সীমা সহজ পায়ে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে এগোতেই পলাশ একলাফে মিমোর কাছে চলে এল। জামার কলার ধরে এক হ্যাঁচকায় বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিল। ছুরিটা ডান হাতে নিয়ে ওর কানের পাশে চেপে ধরল। চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, 'যে-ই আসুক তাকে দরজা থেকে কাটিয়ে দাও। তা নইলে বাচ্চাটার গলা...।'

'থাক! বারবার একই ভয় দেখিয়ে বীরত্ব দেখাতে হবে না!' ঘেন্নার সুরে পলাশকে বাধা দিল সীমন্তিনী ঃ 'আগে দেখি দরজায় কে এসেছে। আমরা স্বাভাবিক ব্যবহার করলে কেউ সন্দেহ করবে না। আপনি যদি উলটোপালটা কিছু করেন তা হলে আমরা কেউই বাঁচব না।'

পলাশ ঘাড় গোঁজ করে ভারি গলায় বলল, 'বি কেয়ারফুল! ভুলে যেয়ো না আমার হাতে কী আছে!'

সীমা দরজা খুলে দিল।

এসো আমার দেবদূত! আমার প্রিয়তম দেবতা! আমার পুরুষোত্তম! তুমি এলে সূর্যোদয় হয়। তুমি বিদায় নিলে সূর্যাস্ত। দিনে তোমায় আলোর কিরণ দিয়ে আরাধনা করি, রাতে নিবেদন করি নক্ষত্রমালা। এসো হে প্রাণপুরুষ! এসো আমার অন্তরতম দীপাবলি!

দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন।

কিন্তু এ কোন দ্বৈপায়ন!

পেশাদারি সেল্‌সম্যানের মতো ওর সাজপোশাক। হাতে বড়-বড় কয়েকটা পলিথিনের প্যাকেট। মুখে পাউডার, গলায় টাই, গা থেকে ভুরভুর করে পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে।

সীমাকে দেখামাত্রই চোখ টিপল দ্বৈপায়ন। তারপর অচেনা সেজে সেল্‌সম্যানের মিষ্টি-মোলায়েম ঢঙে বলল, 'মিস্টার শান্তনু সেনগুপ্ত আছেন? আমি "ফ্যানট্যাসটিক" কোম্পানি থেকে আসছি। আপনারা আজ একটু রাত করে আসতে বলেছিলেন। আপনারা যে-দুটো ইন্সট্রুমেন্ট চেয়েছিলেন সে-দুটো দেখানোর জন্যে নিয়ে এসেছি—।'

রোবটের মতো যান্ত্রিক ঢঙে গড়গড় করে কথা বলে যাচ্ছিল দ্বৈপায়ন। আর একইসঙ্গে দ্রুত নজর বুলিয়ে ঘরের পরিস্থিতি জরিপ করে নিচ্ছিল।

BanglaBook.org

যা বোঝার ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। পলাশ সান্যালকে চিনে নিতে ওর কোনও কষ্ট হল না। লোকটা গুটেকে প্রায় খামচে নিজের কাছে ধরে রেখেছে। গুটের চোখ ভেজা। ভেজা চোখে অবাক হয়ে ওর দিপুদাকে দেখছে।

সীমা ইতস্তত করে বলল, 'আমাদের একজন গেস্ট রয়েছেন—তাই একটু অসুবিধে আছে। পরে কখনও যদি আসেন...।'

'আপনি নিশ্চয়ই মিসেস সেনগুপ্ত?' একগাল হেসে ঘরে ঢুকে পড়ল দ্বৈপায়ন। এমন সহজ ভঙ্গিতে কনুই দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল যেন এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ। তারপর ঃ 'গেস্ট থাকায় আপনাদের সুবিধেই হবে, ম্যাডাম। আপনারা ওঁর ওপিনিয়ানটাও নিতে পারবেন। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না—মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট। এই দেখুন...।'

পলিথিনের বড়-বড় প্যাকেট খুলে দুটো জিনিস বের করল দ্বৈপায়ন।

একটা 'জোনেক্স' কোম্পানির রোলার স্কেট্স-এর বাক্স। আর একটা লম্বাটে আয়তাকার বাক্স—যার ওপরে লাল রঙে বড়-বড় হরফে ইংরেজিতে লেখা 'ফ্লেক্সিবার'।

প্রথম বাক্স খুলে একজোড়া রোলার স্কেট্স বের করে নিল ও। আর দ্বিতীয় বাক্স খুলে টেনে বের করে নিল লম্বা লাঠির মতো একটা জিনিস। লাঠির দু-প্রান্তে মোটরবাইকের হাতলের মতো ফাইবারের তৈরি দুটো হাতল। আর হাতল দুটোকে জুড়ে রেখেছে কালো রঙের মোটাসোটা একটা লম্বা স্প্রিং।

দ্বৈপায়ন যখন ওর 'দোকান' সাজাচ্ছিল পলাশ তখন মিমোকে নিয়ে পা টিপে-টিপে সরে যাচ্ছিল কাচ ভাঙা টিভি-টার কাছে। দ্বৈপায়ন যাতে টিভি-টা দেখতে না পায় সেজন্য ওটাকে আড়াল করে দাঁড়াল পলাশ। মনে-মনে ভাবল, হতচ্ছাড়া সেল্‌সম্যানটা কতক্ষণে এ-ফ্ল্যাট থেকে বিদেয় হবে।

পলাশের চেষ্টা দেখে দ্বৈপায়ন মনে-মনে হাসল। টিভি-র করুণ অবস্থাটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর নজরে পড়েছে। কিন্তু কোনওদিকে না দেখার ভান করে দ্বৈপায়ন উবু হয়ে বসে রোলার স্কেট্স জোড়া নিজের পায়ের মাপে অ্যাডজাস্ট করতে শুরু করল। তারপর পা ছড়িয়ে বসে ওই দুটো দু-পায়ে শক্ত করে বেঁধে নিল। এসব কাজ করতে-করতে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল দ্বৈপায়ন।

'...''জোনেক্স'' কোম্পানির রোলার স্কেট্স একেবারে চ্যাম্পিয়ান। এই মডেলটার দাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা, তবে আমরা এখন একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি—দুশো টাকা। মানে, এক্ষুনি নিলে সাড়ে পাঁচশো পড়বে। এটা মিস্টার সেনগুপ্তও পরতে পারবেন...।' বলে শান্তনু আর পলাশের দিকে ধন্দের চোখে তাকাল ও। যেন বুঝতে চাইছে, কে মিস্টার সেনগুপ্ত।

BanglaBook.org

সীমার বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল। পলাশের শক্ত মুঠোয় ধরা ছুরিটার কথা ও ভোলেনি। দিপু তো ছুরিটার কথা জানে না! কী হবে এখন?

এইসব উথালপাথাল ভাবনার মধ্যেও দ্বৈপায়নের কথাগুলো ওর কানে ঢুকল। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ইনি হলেন শান্তনু সেনগুপ্ত—আমার হাজব্যান্ড। আর ইনি আমাদের গেস্ট—পলাশ সান্যাল। আর ও—' অচ্যুতকে দেখাল সীমা ঃ 'আমাদের ছেলে—অচ্যুত। রোলার স্কেট্‌সটা আমরা ওর জন্যেই চেয়েছি।'

দিপুদাকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখে গুটের মনটা নেচে উঠেছিল। কিন্তু কেমন একটা চাপা ভয় ওকে পাথর করে রেখেছিল। বারবার হেঁচকি মতন উঠছিল। মনে হচ্ছিল, ভেতর থেকে কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে।

এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল বাচ্চাটা। দ্বৈপায়ন শুধু ওর দিকেই নজর রাখছিল। শান্তনু আর সীমন্তিনী হয়তো ওর অভিনয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, কিন্তু গুটে? গুটে যদি হঠাৎ 'দিপুদা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে তা হলেই সর্বনাশ! সেইজন্য বেশ ভয়ে-ভয়ে বাচ্চাটাকে দেখছিল দ্বৈপায়ন। ও যদি হঠাৎ—।'

গুটে কিছু একটা বলার জন্য সবে হাঁ করতেই দ্বৈপায়ন বিচ্ছিরিভাবে ওকে ধমকে উঠল, 'একদম চুপ!' তারপর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওকে চুপ করে থাকতে ইশারা করল।

গুটে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেল। ওর চোখে জল চলে এল আবার।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য দ্বৈপায়ন মোলায়েম হেসে নরম গলায় বলল, 'রাগ কোরো না, অচ্যুত। ডিমনস্ট্রেশান দেওয়ার সময় কেউ কথা বললে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। সবকিছু মুখস্থ-টুখস্থ করে আমরা তো তৈরি হয়ে আসি, কেউ ডিসটার্ব করলে সেগুলো কেমন গুলিয়ে যেতে চায়। দাদা, বউদি—আপনারা কিছু মাইন্ড করবেন না...প্লিজ! আমার বলা হয়ে যাক, তারপর আপনারা যত খুশি প্রশ্ন করবেন।'

ফ্লেক্সিবারটা হাতে নিয়ে দ্বৈপায়ন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘরের মেঝেতে স্কেট করে ও এপাশ-ওপাশ সামান্য ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই শান্তনু আর পলাশকে লক্ষ করে ও যান্ত্রিকভাবে ওর যন্ত্রের গুণগান করতে শুরু করল।

'...দেখুন, আমাদের কোম্পানি কখনও লো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট বিক্রি করে না। এই যে স্কেট্‌স দেখছেন, এর চেসিসগুলো স্টিলের তৈরি, আর চাকাগুলো ইমপোর্টেড। স্কেট্‌স-এর চাকাই হল আসল। চাকা একবার নষ্ট হয়ে

BanglaBook.org

গেলে আর রিপ্লেস করা যায় না। তখন নতুন স্কেট্স কিনতে হয়—একজোড়া। কারণ, সিঙ্গল স্কেট পাওয়া যায় না—সবসময় পেয়ারে সাপ্লাই আসে।'

কথা বলতে-বলতে চাকা গড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দ্বৈপায়ন। এইবার ও ফ্লেক্সিবারটা তুলে ধরল।

'এটার নাম ''ফ্লেক্সিবার''। এটাও আপনারা দারুণ সিলেক্ট করেছেন। এটা মুম্বইয়ের 'স্ম্যাশ'' কোম্পানির প্রোডাক্ট। আমরা মাত্র বছরখানেক এজেন্সি নিয়ে দুর্দান্ত রেসপন্স পেয়েছি। দু-পাশের এই হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরে বারটাকে বেঁকাতে হয়...।' দ্বৈপায়ন দু-পাশের হাতল ধরে আড়াই ফুট মতন লম্বা বারটাকে বেশ সহজেই বেঁকিয়ে ধরল ঃ 'এইভাবে বেঁকালে বাইসেপ আর ট্রাইসেপ তৈরি হয়। বারটা ছেড়ে দিলেই স্প্রিং-এর অ্যাকশনে ওটা আবার লাঠির মতন সোজা হয়ে যায়। এর বাক্সের ভেতরে ফ্লেক্সিবারের নানারকম ব্যায়ামের চার্ট আছে। ওটা একবার দেখে নিলেই আর কোনও প্রবলেম হবে না। আর হলে আমাদের কোম্পানি তো আছেই। নিন, হাতে নিয়ে একবার টেস্ট করে দেখুন—।'

ফ্লেক্সিবারের গুণপনার ব্যাখ্যা করতে-করতে দ্বৈপায়ন পলাশের কাছে এসে পড়েছিল। পলাশ বেশ বিরক্ত হয়ে বেহায়া সেল্‌সম্যানটাকে দেখছিল। মিমোকে জাপটে ধরে ভাঙা টিভি-টার প্রায় গায়েই দাঁড়িয়ে ছিল ও। ভাবছিল, কতক্ষণে আপদ বিদেয় হবে।

কিন্তু দ্বৈপায়ন যে হঠাৎ ওকে আক্রমণ করবে সেটা পলাশ বুঝতে পারেনি।

ফ্লেক্সিবারটা 'ইউ' অক্ষরের মতো বেঁকানো অবস্থায় স্কেট করে পলাশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল দ্বৈপায়ন। আচমকা ও বারের একটা দিক ছেড়ে দিল।

স্প্রিং-এর টেনশানে ছিটকে সোজা হয়ে গেল বারটা। ওটার ভারি শক্ত হাতল দ্বৈপায়নের হিসেব মতো পলাশের ডান গালে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

বিশ্রী শব্দ হল একটা। পলাশের গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। সংঘর্ষের ধাক্কায় টিভি-র দিকে হেলে পড়ল পলাশ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই 'বাস্টার্ড' বলে দ্বৈপায়ন ডান পায়ে এক তীব্র লাথি কষাল পলাশের দু-পায়ের ফাঁকে। রোলার স্কেটের ইস্পাতের চেসিস পলাশের শরীরে বোধহয় কেটে বসল। কারণ, পলাশ এইবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। ও লাট খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ওর চশমা ছিটকে পড়ল দূরে।

সীমন্তিনী গলা ফাটিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল—যে-চিৎকারটা ও এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে করতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি।

BanglaBook.org

শান্তনু যেন এক অলৌকিক মন্ত্রের জোরে ঘোর কাটিয়ে উঠল। ও 'মিমো! মিমো!' করে আর্ত স্বরে ডেকে উঠল।

পলাশ মিমোকে আঁকড়ে ধরে ছিল। তাই ওর শরীরটা বেটাল হয়ে মেঝেতে পড়ে যেতে বাচ্চাটাও একইসঙ্গে কাত হয়ে পড়ল ওর গায়ে।

পলাশ সেই অবস্থাতেই বাচ্চাটার চুলের মুঠি চেপে ধরল। আর মিমো গোঙানির মতো একটা চাপা চিৎকার করে কামড় বসিয়ে দিল পলাশের পেটে।

যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল পলাশ। মিমোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। মিমো ছাড়া পেয়েই কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল মায়ের দিকে। সীমন্তিনী ওকে পাগলের মতো জাপটে ধরল। কাঁদতে-কাঁদতেই ওর কপালে-গালে-মাথায় চুমু খেতে লাগল। আর বারবার বলতে লাগল, 'বাবুসোনা, তোর লাগেনি তো! বাবুসোনা, তোর লাগেনি তো!'

দ্বৈপায়নের কাজ তখনও শেষ হয়নি। ও ফ্লেক্সিবারটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করতে লাগল। ধোপারা যেভাবে মুগুর পিটিয়ে কাপড় কাচে, ও ফ্লেক্সিবার দিয়ে পলাশকে সেভাবে 'কাচতে' লাগল।

এত হইচই চেঁচামেচিতে বাসন্তী আবার ড্রইং স্পেসে চলে এসেছিল। মিমোর হাতে রক্ত দেখে ও কেঁদে ফেলল। শান্তনু মিমোর কাছে এসে ওর হাতটা পরীক্ষা করে বুঝল, মিমোর কিছু হয়নি। পলাশের রক্ত ওর গায়ে লেগেছে।

ওরা চারজন এক জায়গায় জড়ো হয়ে দ্বৈপায়নের কীর্তি দেখছিল। ওর ইস্পাতের মতো দেহটা নমনীয় হয়ে যেভাবে খুশি বেঁকে যাচ্ছিল, আর পলাশকে আড়ং ধোলাই দিচ্ছিল। কখনও ওর হাত চলছিল, কখনওবা পা। রোলার স্কেট্স-এর এইরকম অমানুষিক অপব্যবহার কেউ কোনওদিন কল্পনাও করেনি।

পলাশের সারা শরীরে রক্ত। পোশাক-আশাক নানা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ওর অসাড় দেহটা একতাল কাদার মতো টিভি-র কাছে পড়ে আছে। কান্না ও যন্ত্রণা মেশানো একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসছে ওর মুখ থেকে। শুধু তাতেই বোঝা যাচ্ছে ও এখনও খতম হয়নি।

দ্বৈপায়ন বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল। সীমা আর মিমোকে যে গায়ে আঁচড় কাটে দ্বৈপায়নের হাতে তার নিস্তার নেই।

রাস্তায় মোটর বাইক রেখে বাড়িতে ঢোকার সময় ও শক্তিমানের ছবিটা দেখতে পায়। ও অবাক হয়ে ওটা হাতে তুলে নিয়েছিল। এটা রাস্তায় ফেলে দিল কে? চোখ তুলে সীমাদের ফ্ল্যাটের জানলার দিকে তাকিয়েছিল দ্বৈপায়ন।

BanglaBook.org

সীমা কি মিমোর ওপর চটে গেছে? না কি অন্য কোনও বিপদ দেখা দিয়েছে সেখানে? যে-ছবিটা গুটের প্রাণ সেটা কেন অবহেলায় রাস্তায় পড়ে আছে?

শক্তিমানের ছবিটা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল দ্বৈপায়ন। তারপর ফোন করেছিল শান্তনুদের ফ্ল্যাটে। ফোনের ঘণ্টি বেজেই চলল, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। অথচ দ্বৈপায়ন স্পষ্ট দেখেছে, ওদের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে।

দ্বৈপায়নের সন্দেহটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। ওর মাথার ভেতরে ব্যাগাটেলির গুলি দৌড়তে শুরু করল। কী করা উচিত এখন?

কয়েকমিনিট ধরে নানান চিন্তা করার পর দ্বৈপায়ন লালবাজারে বিজয় মিত্রের দেওয়া ফোন নম্বরে ফোন করেছে। বিজয় মিত্রের নামে ইমারজেন্সি মেসেজ দিয়ে দিয়েছে আর-একজন অফিসারের কাছে। তারপর আবার ভাবতে বসেছে। শান্তনুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে কি ও নক করবে? নাকি আগেভাগেই শোরগোল তুলে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ফেলবে? কিন্তু তারপর যদি দ্যাখে যে, সেরকম কিছুই হয়নি!

এইরকমের বহু উলটোপালটা চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত দ্বৈপায়ন যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে।

সীমন্তিনী আর শান্তনুর চিৎকারে দ্বৈপায়নের ঘোর কাটল। সীমা ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল ঃ 'ঢের হয়েছে, দিপু! আর না। এবার থামো। লোকটা বোধহয় মরেই গেছে।'

দ্বৈপায়ন থামল। ফ্লেক্সিবারে লাঠির মতো ভর দিয়ে ও হাপরের মতো হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিয়ে বলল, 'লালবাজারে ফোন করে দিয়েছি। ওরা এখুনি হয়তো এসে পড়বে। এই লোকটাকে এখানে আটকে রেখে তোমরা আমাদের ফ্ল্যাটে চলো—।'

সীমার সঙ্গে-সঙ্গে মিমোও চলে এসেছিল দ্বৈপায়নের কাছে। দ্বৈপায়ন ওকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল। এক হাতে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'গুটে, তোর আর কোনও ভয় নেই...।'

বাচ্চাটা দ্বৈপায়নের কোমরের কাছে মুখ গুঁজে রইল। একটু পরে আড়চোখে তাকাল নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা পলাশের দিকে। ইতস্তত করে বলল, 'এই...এই লোকটা মা-মার্ডারার?'

দ্বৈপায়ন হেসে বলল, 'হ্যাঁ, মার্ডারার।'

'কাল সকালে আমাকে রোলার এস্কেট শেখাবে তো?'

'হ্যাঁ, শেখাব।' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল দ্বৈপায়ন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাসন্তী চাপা চিৎকার করে উঠল। কারণ, পলাশের নড়াচড়া ও প্রথম লক্ষ করেছে।

BanglaBook.org

শান্তনুও ব্যাপারটা দেখেছিল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

পলাশ মেঝেতে দেড় পাক গড়িয়ে চোখের পলকে চলে এল মিমোর কাছে। ওর পা ধরে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকা মারল। দ্বৈপায়নের আলতো বাঁধন ছিঁড়ে মিমো শব্দ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। চিতাবাঘ যেভাবে হরিণ ধরে, পলাশ সেইরকম হিংস্র ক্ষিপ্র ঢঙে মিমোকে এক টান মেরে নিয়ে এল নিজের কাছে। তারপর, মেঝেতে শোওয়া অবস্থাতেই, ও কোথা থেকে যেন বের করে নিল লুকোনো ছুরিটা। অমানুষের মতো নিষ্ঠুরভাবে ওটার বাঁকানো ফলা মিমোর গলায় চেপে ধরল। ফ্যাঁসফেঁসে চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'সবাই দূরে সরে যা। কেউ চেঁচাবি না। তা হলে সত্যি-সত্যি এটার গলা কেটে দেব।'

পলাশকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। মুখের নানা জায়গায় রক্তের ছোপ। জামাকাপড় বিধ্বস্ত। চশমা না থাকায় চোখ দুটো কেমন অচেনা লাগছে। আর মিমো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

নতুন করে ভয় আর আশঙ্কা নেমে এল ঘরের ভেতরে।

শান্তনু, সীমন্তিনী আর দ্বৈপায়ন পলাশের নির্দেশমতো কয়েক পা দূরে সরে গেল।

পলাশ কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল। মিমোকেও টান মেরে দাঁড় করালো। ছুরিটা ওর ডান চোয়ালের নীচে গলায় সামান্য চাপ দিয়ে বসানো। ছুরির ধারালো ডগার চাপে গলার নরম চামড়া কেটে গিয়ে রক্তের বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

পলাশ পাগলের মতো ভয়ঙ্কর উদভ্রান্ত চোখে ওদের চারজনকে একে-একে দেখে নিল। চশমা না থাকায় মুখগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছে, তবে এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

বাসন্তীকে লক্ষ করে খিঁচিয়ে উঠল পলাশ, 'দরজায় খিল-ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দে। যে-কেউ হাজার ডাকলেও দরজা খুলবি না।'

বাসন্তী ভয়ে কঁকিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে দরজার খিল আর ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দিল।

দ্বৈপায়নের দিকে আঙুল তুলে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে পলাশ জানতে চাইল, 'এই লোকটা কে? ঠিক-ঠিক জবাব দিবি। নইলে তোর ছেলের ছুটি করে দেব। স্কুলে ওর ক্লাসে একটা সিট খালি হয়ে যাবে।'

শান্তনু হোঁচট খাওয়া গলায় বলল, 'ও দ্বৈপায়ন—আমাদের সামনের ফ্ল্যাটে থাকে।'

মিমোর চুলের মুঠি ধরে পলাশ ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা শো-কেসের কাছে। নিষ্ঠুরভাবে মাথাটা ঠুকে দিল শো-কেসের গায়ে। তারপর শান্তনুর দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'সত্যি করে বল, এই লোকটা কে!' পলাশ তখনও হিংস্রভাবে বাচ্চাটার চুলের মুঠি ধরে রয়েছে। চোখে পাগলের মরিয়া দৃষ্টি।

সীমন্তিনী কেঁদে উঠে ভাঙা জড়ানো গলায় সব বলল পলাশকে। বারবার করে অনুরোধ করল, 'আপনি যা বলবেন তা-ই শুনব। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন—প্লিজ।'

'ছেড়ে দেব! ও হল আমার ফিক্সড ডিপোজিট।' মিমোর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল পলাশ। তারপর দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হিরো, ওই ফ্লেক্সিবারটা আমার দিকে ছুড়ে দে।'

দ্বৈপায়ন চুপচাপ কথা শুনল। বারটা আলতো করে ছুড়ে দিল পলাশের পায়ের কাছে।

এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

আচমকা কলিং বেলের শব্দে ওরা সবাই চমকে উঠল।

'কোনও শালাকে ফ্ল্যাটে ঢোকাবি না!' চাপা গর্জন করল পলাশ, 'সীমাসুন্দরী, তুমি শিগগির যাও—দরজা না খুলে চেঁচিয়ে যা-হোক বলে উটকো পাবলিককে ফোটাও। জলদি! কুইক!'

দরজার কাছে যাওয়ার আগে ছেলের দিকে একবার তাকাল সীমা। চোখ-মুখের কী অবস্থা হয়েছে ওর! ভয়ে যেন ঠাণ্ডা পাথর হয়ে গেছে। কান্নার একটা ভাঙা টুকরো বেরিয়ে এল সীমার গলা চিরে। ও দরজার কাছে গিয়ে ডেকে উঠল, 'কে?'

'মিসেস সেনগুপ্ত, আপনাদের ফ্ল্যাটে কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি?'

গলাটা চেনা-চেনা মনে হল সীমার। চারতলার মিস্টার সিন্‌হা হতে পারেন।

ও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'না, না,—সেরকম কিছু না। আমাদের নিজেদের ব্যাপার।'

'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে। যা হোক করে একটু মানিয়ে-টানিয়ে নিন।'

দরজার ওপারে আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

পলাশ ছুরিটা বাঁ হাতে চালান করে দিয়ে ফ্লেক্সিবারটা ডান হাতের শক্ত মুঠোয় তুলে নিয়েছিল। ছুরিটা মিমোর বাঁ চোয়ালের নীচে চেপে ধরে ও দ্বৈপায়নকে এবার কাছে ডাকল—ঠিক যেভাবে লোকে পোষা কুকুরকে ডাকে ঃ 'আ যা, মেরে হিরো, আ যা! আঃ, তু তু তু...।'

রোলার স্কেট্‌স পরা পায়ে মেঝেতে শব্দ করে কয়েক পা এগিয়ে এল

BanglaBook.org

দ্বৈপায়ন। ও পলাশের চোখে তাকিয়ে বুঝতে চাইছিল পাগল খুনিটা ঠিক কী করতে চায়।

'এবার মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়! কুইক!' কড়া গলায় হুকুম দিল পলাশ, 'নইলে এই ছোঁড়াটাকে খালাস করে দেব। নে, শুয়ে পড়, জলদি!'

স্কেট্‌স পরা পায়ে শুয়ে পড়তে একটু অসুবিধে হল বটে কিন্তু দ্বৈপায়ন মুখ বুজে পলাশের কথা মেনে নিল। অবশ্য না মেনে কোনও উপায়ও ছিল না।

উপুড় হয়ে শুয়ে ও ভাবতে লাগল প্রথম আঘাতটা ঠিক কীভাবে আসবে। আচ্ছা, ইন্সপেক্টর বিজয় মিত্র কি ওর দেওয়া ইমারজেন্সি মেসেজটা পেয়েছেন? ওঁরা খবর পেয়ে আসবেন তো?

'শালা, শুয়োরের বাচ্চা!' মুখ খিস্তি করে মেঝেতে থুতু ছেটাল পলাশ ঃ 'থুঃ!' তারপরই ফ্লেক্সিবারটা প্রবল বেগে শূন্যে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল দ্বৈপায়নের মাথার পিছনদিকে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ফাইবারের হাতলের একটা অংশ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

দ্বৈপায়ন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কিন্তু পলাশের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। এক হাতে মিমোকে জাপটে রেখে অন্য হাতে ও দ্বৈপায়নের শুয়ে থাকা শরীরটাকে পেটাতে লাগল। আর অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল।

সীমন্তিনী চিৎকার করে মারতে বারণ করে ছুটে আসতে চাইছিল, কিন্তু পলাশ দাঁত খিঁচিয়ে মিমোর গলায় আলতো করে ছুরির আঁচড় টেনে দিল। রক্তের রেখা ফুটে উঠল ওর গলায়। আর বাচ্চাটা প্রাণভয়ে 'মা! মা!' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

শান্তনু আর সহ্য করতে পারছিল না। ও মনে-প্রাণে জ্ঞান হারাতে চাইছিল। শুকনো খসখসে গলায় ও পলাশকে আর্ত প্রার্থনা জানাল, 'মিমোকে ছেড়ে দে, ভাই। তুই যা চাস সব নিয়ে নে—।'

পলাশ দ্বৈপায়নকে পেটানো থামিয়ে শান্তনুর দিকে ঘুরে তাকাল। হেঁচকি তুলে খলখল করে হাসল ঃ 'দ্যাখ, শালা! ওই হিরো—' দ্বৈপায়নের দিকে আঙুল দেখাল পলাশ ঃ 'আর আমি ভিলেন—' নিজের বুকে হাত ঠুকল এবার ঃ 'দেখি, হিরোর প্রাণভোমরা বডি ছেড়ে বেরোয় কি না!' ফ্লেক্সিবার বাগিয়ে ধরে আবার তৈরি হল পলাশ।

ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে উঠল আবার।

পলাশ চমকে ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। তারপর সীমাকে ইশারা করল। যার অর্থ হল, যে-ই এসে থাকুক তাকে যা-হোক কিছু বুঝিয়ে নিরস্ত করো।

BanglaBook.org

সীমা দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এল, 'আমি—মানে, আমরা—আপনাদের হেল্প করতে এসেছি।'

চেনা গলা। ইন্সপেক্টর বিজয় মিত্র।

সীমার বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল। কী বলবে এখন ও? ঠোঁট কামড়ে বিহ্বল চোখে হতভাগা বাচ্চাটার দিকে একবার তাকাল সীমা।

পলাশ বিজয় মিত্রের কথাগুলো শুনতে পায়নি। কিন্তু সীমার চাউনিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। তাই অসভ্যের মতো খেঁকিয়ে উঠল, 'যে-ই হোক দরজা খুলবি না!' এক হ্যাঁচকায় মিমোকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল। চঞ্চল চোখে ফ্ল্যাটের এপাশ-ওপাশ জরিপ করল।

সীমা বারকয়েক ঢোঁক গিলে কোনওরকমে বলল, 'আমরা ব্যস্ত আছি। দরজা খোলা যাবে না। পরে আসবেন।'

'মিসেস সেনগুপ্ত, কীসব আবোলতাবোল বকছেন!' বিরক্ত গলায় বললেন বিজয় মিত্র, 'পলাশ সান্যাল কি ভেতরে আছে?'

'হ্যাঁ—।'

'আপনাদের ভয় দেখাচ্ছে?' এবার চাপা গলায় কথা বললেন বিজয় মিত্র।

'হ্যাঁ।'

'ওর কাছে রিভলবার আছে?'

'না—না।'

'ছুরি?'

'হ্-হ্যাঁ।'

'আপনার বাচ্চাটা কি ভেতরে আছে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—।' এবার কেঁদে ফেলল সীমন্তিনী। আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার চাপে ওর বুকের ভেতরটা যেন জমাট বেঁধে ছিল। হঠাৎই সেটা গলতে শুরু করল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল সীমা। ওর কান্না কিছুতেই আর থামতে চাইছিল না।

হিংস্র বাঘের গলায় সীমাকে ডাকল পলাশ, 'আই! এদিকে চলে আয়!'

শান্তনু সীমার কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইল। বলল, 'কোনও ভয় নেই। এপাশে চলে এসো।'

ঠিক তখনই দরজায় রুক্ষ আঘাত পড়ল। বেপরোয়াভাবে দরজায় লাথি মারছে কেউ।

পলাশ মিমোকে টেনে নিয়ে দেওয়ালের এক কোণে চলে গেল। চিৎকার

BanglaBook.org

করে বলতে লাগল, 'ঘরে কেউ ঢুকলেই বাচ্চাটার গলা কেটে দেব! ওদের বারণ কর বলছি!'

সীমার কান্না একফোঁটাও থামেনি।

শান্তনু কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

বাসন্তী ওদের কাছটিতে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

আর দ্বৈপায়নের অসাড় দেহটা সামান্য নড়েচড়ে উঠল।

আধমিনিটও লাগল না। দরজার কাঠ ফেটে গেল। দুটো অজানা-অচেনা হাত সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে খিল-ছিটকিনি খুলে ফেলল। তারপরই ঘরে ঢুকে পড়ল চারজন মানুষ। দুজন সাদা-পোশাক, আর দুজন উর্দি-পরা কনস্টেবল। সাদা-পোশাকের একজনকে শান্তনু আর সীমন্তিনী চিনতে পারল ঃ বিজয় মিত্র।

দরজার বাইরে উৎসাহী জনতার ভিড় জমে গিয়েছিল। বিজয় মিত্র কনস্টেবল দুজনকে দরজায় মোতায়েন করে দিলেন। তারপর হাঁপ ছেড়ে একগাল হেসে বললেন, 'যাক, আর কোনও ভয় নেই। আমরা এসে পড়েছি।' সীমন্তিনীর দিকে ফিরে ঃ 'ম্যাডাম, আমাদের একটু চা খাওয়ান। গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে।'

বিজয় মিত্রের আচরণে সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম একটা বিপজ্জনক মুহূর্তে ভদ্রলোক যেন পিকনিক করতে এসেছেন।

ভুঁড়ি সামলে হেলেদুলে হেঁটে বিজয় মিত্র একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। তারপর এই প্রথম যেন দ্বৈপায়ন আর পলাশকে দেখতে পেলেন। পলাশকে বললেন, 'কী ব্যাপার? আপনারা দুজন মারপিট করছিলেন নাকি? আর বাচ্চাটাকে ওভাবে ধরে আছেন কেন? ওকে ছেড়ে দিন।' সীমন্তিনীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঃ 'ম্যাডাম, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, প্লিজ। আমার তাড়া আছে— এক্ষুনি চলে যাব। চা-টা একটু জলদি হলে ভালো হয়।'

দ্বৈপায়নের গলা দিয়ে 'উঃ-আঃ' শব্দ বেরোচ্ছিল। বিজয় মিত্র সঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যানার্জি, একে তুলে বাথরুমে নিয়ে যান। মাথায় জল-টল দিয়ে দেখুন কী ধরনের ইনজুরি হয়েছে। সেরকম বুঝলে হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

ব্যানার্জি কোনও কথা না বলে দ্বৈপায়নকে অনায়াসে চাগিয়ে দু-হাতে তুলে নিলেন। তারপর শান্তনুর দিকে চোখের ইশারা করে জানতে চাইলেন, বাথরুমটা কোনদিকে। শান্তনু দেখিয়ে দিতেই সেদিকে চলে গেলেন।

সীমন্তিনী বাসন্তীকে পাঠাল চা তৈরি করতে। কান্না থামিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে

BanglaBook.org

ও বিজয় মিত্রকে দেখছিল। পলাশও অবাক সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছিল এই অদ্ভুত অফিসারের দিকে।

এবার শান্তনুর দিকে তাকালেন বিজয় মিত্র ঃ 'মিস্টার সেনগুপ্ত, আসুন—এখানে এসে বসুন—আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

শান্তনু বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনল। বিজয় মিত্রের কাছাকাছি একটা সোফায় বসে আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি...আমাদের...।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। ব্যস্ত হতে হবে না—চুপ করে বসে একটু জিরোন, চা-টা খান—তারপর কথা হবে।'

'মিমো—।' ঘরের আর-এক প্রান্ত থেকে সীমা ছেলের নাম ধরে ডেকে উঠল।

তখনই যেন বিজয় মিত্র পলাশকে আবার খেয়াল করলেন ঃ 'আরে, কী হল! আপনাকে বললাম না বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন। ওকে ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বসুন—কথা আছে।'

পলাশ হঠাৎই রাগে ফেটে পড়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে আটকালে বাচ্চাটার গলা কেটে দেব!' মিমোর চুলের মুঠি ধরে হিংস্রভাবে ঝাঁকিয়ে ওর মাথাটা কাত করে ধরল পলাশ। তখনই ওর গলায় ভয়ঙ্করভাবে চেপে ধরা ছুরিটা স্পষ্ট দেখা গেল।

'আমি এখান থেকে চলে যাব—' হিসহিস করে বলল পলাশ, 'ওদের বলুন পথ ছেড়ে দিতে। কেউ যেন আমাকে না আটকায়।'

বিজয় মিত্র হাসলেন, বললেন, 'পলাশবাবু, আপনাকে আটকাতে আমরা আসিনি। আপনার এগেইন্‌স্টে কোনও অভিযোগ কিংবা প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করতেও চাই না। আপনি শুধু বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন।' শেষ কথাটা বলার সময় বিজয় মিত্রের গলাটা কেমন ঠাণ্ডা শোনাল।

'না! ছাড়ব না!' দুপাশে মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করল পলাশ।

'এই আপনার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ—।'

'তা হলে আপনি চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন।' হেসে বললেন বিজয় মিত্র। এবং মোটা শরীরটাকে একপাশে কাত করে পকেট থেকে একটা ছোট মাপের অটোমেটিক পিস্তল বের করলেন। চোখ দিয়ে মেপে দেখলেন, তাঁর কাছ থেকে পলাশের দূরত্ব প্রায় বারো-তেরো ফুট।

পিস্তলটা দেখেই শান্তনুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। সীমন্তিনী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

BanglaBook.org

পিস্তলটা নেড়েচেড়ে পলাশকে দেখালেন বিজয় মিত্র ঃ 'এটা লামা অটোমেটিক পিস্তল। সোয়া ছ'ইঞ্চি ব্যারেল। ওজন ছ'শো গ্রাম মতন। আটটা গুলি করা যায়। দেখতে ছোট হলে কী হবে, ভীষণ কাজের।'

'সীমা, লোকটাকে ভয় দেখাতে বারণ করো!' চেঁচিয়ে বলল পলাশ, 'নইলে আমি কিন্তু মিমোকে খতম করে দেব!'

'পলাশবাবু, আপনি কখনও ষাঁড়ের লড়াই দেখেছেন?' হাসিমুখেই জানতে চাইলেন বিজয় মিত্র, 'ওই যে, স্পেনে যেটা হয়। তাতে ম্যাটাডর যখন ছুটে আসা ষাঁড়টাকে তরোয়াল দিয়ে শেষ করে তখন তার মধ্যে একটা অঙ্কের হিসেব থাকে। ম্যাটাডর চার্জিং বুলের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ায়। ষাঁড়টা মাথা নিচু করে ধুলো উড়িয়ে তার দিকে ধেয়ে আসে। যখন ষাঁড়টা ম্যাটাডরের গায়ের কাছে এসে যায় তখন সামনে, ষাঁড়ের দু-শিং-এর ফাঁকে, ঝুঁকে পড়ে ম্যাটাডর একটা বিশেষ জায়গায় তরোয়ালটাকে আমূল ঢুকিয়ে দেয়। জায়গাটা হল, কুঁজের সামনে, দু-কাঁধের জোড়ের ঠিক মাঝে, একটা টোল খাওয়া ছোট্ট অঞ্চল। ম্যাটাডরের সোজা সরু তরোয়ালটা এখানে বিঁধিয়ে দিলে সেটা মাখন কেটে বসার মতো স্ট্রেট ভেতরে ঢুকে যায়। আর লাইটের সুইচ অফ করে দেওয়ার মতো ষাঁড়টার প্রাণবাতি তক্ষুনি নিভে যায়। ওটা জাস্ট খসে পড়ে ম্যাটাডরের পায়ের কাছে, একফোঁটা ছটফট করতে পারে না। কারণ, ওটার মেইন আর্টারিটা ড্যামেজ হয়ে যায়...।'

পলাশ অধৈর্য হয়ে পড়লেও বিজয় মিত্রের কথাগুলো শুনছিল। ব্যাঙ যেমন সাপের কথা 'শোনে'।

বাসন্তী সত্যি-সত্যি চার কাপ চা নিয়ে এল ট্রে-তে করে। কাপ-প্লেটগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় বিশ্রী ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছিল। কারণ, ওর হাত কাঁপছিল।

শান্তনু অসহায় বাচ্চাটার দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। ওর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। মিমো যা-যা বায়না করবে এখন থেকে ও সবই কিনে দেবে। শুধু আজ কেউ ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে দিক।

বিজয় মিত্র হেসে একটা কাপ তুলে নিলেন বাঁ হাতে। তাতে শব্দ করে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির 'আঃ!' শব্দ করলেন।

ব্যানার্জি ভেতর থেকে ড্রইং স্পেসে চলে এলেন। বিজয় মিত্রের কাছে এসে বললেন, 'ওঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে। শোওয়ার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছি। একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলে ভালো হয়।'

'গুড। একটু পরে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করছি। এখন নিন, চা খান।'

BanglaBook.org

ব্যানার্জি ইতস্তত করে দাঁড়িয়েই রইলেন। তিনি বিজয় মিত্রের হাতের পিস্তলটার দিকে দেখছিলেন, আর দেখছিলেন পলাশের দিকে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম।' কাপ টেবিলে রেখে বিজয় মিত্র আবার বলতে শুরু করলেন, 'পলাশবাবু, এখানে আপনি হলেন খ্যাপা ষাঁড়, আর আমি মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা উদ্ভট চেহারার ম্যাটাডর। তবে সোর্ডের চেয়ে বন্দুক-পিস্তল এসব আমার বেশি পছন্দ। আমি এখন যে আপনাকে ঠিক দু-ভুরুর মাঝে গুলি করব তাতে আপনার মাথার ভেতরে করপাস ক্যালোসাম, থ্যালামাস আর হাইপোথ্যালামাস সব তালগোল পাকিয়ে ভুনি খিচুড়ি হয়ে যাবে। মানে, এককথায় বলতে গেলে, আপনার বাতি নিভে যাবে। অবশ্য আপনার মাথার পেছনের দেওয়ালটা ইয়ে-টিয়ে লেগে একটু নোংরা হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করার নেই। আমি যে-কোনও হার্ড ক্রিমিনালকে প্রথমে রিকোয়েস্ট করি...তারপর বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু করে দিই।' হাসলেন বিজয় মিত্র।

এবং হাসতে-হাসতেই কথা থামিয়ে পলাশকে গুলি করলেন।

বন্ধ ফ্ল্যাটে সাইকেলের টায়ার ফাটার শব্দ হল।

সীমা আর বাসন্তী চিৎকার করে উঠল।

শান্তনু ছুটে গেল মিমোর দিকে।

ঘরে বারুদের পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল।

পলাশের মৃতদেহটা তখন দেওয়াল ঘষটে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ছে। ওর চোখে প্রাণহীন শূন্য দৃষ্টি। দেখেই বোঝা যায় বাতি নিভে গেছে।

বিজয় মিত্র পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ব্যানার্জিকে বললেন, 'নিন, আমার কাজ শেষ। এবার আপনার কাজ শুরু।'

চায়ের কাপে আর-একবার চুমুক দিয়ে বিজয় মিত্র বাসন্তীকে লক্ষ করে বললেন, 'চা-টা হেভি হয়েছে, মা-মণি। তবে চিনি একটু কম হয়েছে। একটু চিনি দিতে পারো?'

শান্তনু, সীমা আর মিমো তখন একে অন্যকে জাপটে ধরে যা খুশি তাই করছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG